লাভ ম্যারেজ
Love Marriage
ড. আলী তানতাবী

প্রত্যাশা

সত্য-সুন্দর তারুণ্য আজ সোনার হরিণ। সন্ত্রাস, রাহাজানি, লুটপাট, খুন আর পাপাচারে প্লাবিত সমাজের চিত্র আজ বড়ই করুণ। যুবকদের হাত আজ খুনের রক্তে রঞ্জিত-বিষাক্ত। তাই সুষ্ঠু সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র দেখে চোখ জুড়ানোর স্বার্থেই যুবকদের সামনে সত্যের পরিচয় তুলে ধরা অপরিহার্য। তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে অন্ধকার হতে। যেই সমাজের যুবকরা যত বেশি সত্যের অনুরাগী সেই সমাজে ততই শান্তির সুবাতাস বয়ে বেড়ায়। সত্যানুরাগী আদর্শ যুবকরাই পরিবর্তন আনতে পারে ঘুণেধরা অস্থির সমাজে। তাই অবক্ষয়রোধে প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনার।

যুবক-যুবতিরা যদি আলোর সন্ধান পায়, তাদের নাগালে যদি থাকে সত্যের দীপশিখা; তাহলে তারা অন্তত নিজের জীবনটা ভয়ঙ্কর আঁধারের নিকষ অমানিশা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। আর তারা যদি মুক্তি পায় তাহলে মুক্তি পাবে পরিবার, সমাজ ও দেশ। এই যুবক-যুবতি তথা সকল নারী-পুরু-ষের কাছে যুগোপযোগী মুক্তির পয়গাম পৌছে দিতে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মিসরের দরদি সাহিত্যিক শায়খ ড. আলী তানতাবী রহ.। তিনি মানবতার কাণ্ডারির বেশে আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের যুবক-যু-বতিদের। তিনি তাদের মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন নিষ্ঠার সাথে, দরদি মনে। দিয়েছেন চমৎকার সব টিপস্ ও নানা প্রেসক্রিপশন। সাহিত্যাকাশে তাঁর সেই সৃষ্টি নিঃসন্দেহে কালজয়ী।

ব্যক্তিজীবনে আদর্শ মানুষ হয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাতলাভের ভিন্ন স্বাদের চমৎকার সেই সব টিপসই 'লাভ মেরিজ' শিরোনামে সংকলিত। আশা করি টক-মিষ্টি-ঝাল ভরা এ বইটি সকলের প্রাণের খোরাক জোগাবে।

প্রচ্ছদ : হা মীম কেফায়েত

লাভ ম্যারেজ
LOVE MARRIAGE

মূল
ড. আলী তানতাবী

অনুবাদ
মাওলানা এসএম আনওয়ারুল করীম
গবেষক, কলামিস্ট ও মিডিয়া আলোচক
মুহাদ্দিস, ওলামানগর দারুল উলুম মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭
e-mail: boighorbd@gmail.com, boighor2008@gmail.com
web: www. boighorbd.com

অর্পণ

জীবনের উত্তাল তরঙ্গে অবিরাম সাঁতারকালে
ঢেউয়ের তীব্রতায় তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে
এক চিলতে খড়কুটোর প্রতিচ্ছবি হয়ে
যার অবয়ব আমার ভঙ্গুর হৃদয়পটে
আশার আলো যোগায়;
যার মাঝে খুঁজে পাই আমার তিন জান্নাতকে
বুকে আগলে রাখার নিরন্তর ভরসা
সেই জীবনসঙ্গিনী–
উম্মে রুম্মানকে

–অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

তারুণ্য ও যৌবন মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুসর্গ। এ বয়সের যুবকরা দেশ জয় এমনকি বিশ্বজয়ে অসামান্য অবদান রাখে। এ টগবগে যুবকরাই দেশ-মাতৃকা রক্ষায়.বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। যে কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এরাই বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় হাসিমুখে। এরা পরোয়া করে না বুলেট-কামানের। ন্যায়ের ঝাণ্ডা উড্ডীনকরণে দেশে দেশে এ যুবক-যুবতিদের অকৃত্রিম অবদানের কথা সোনালি ইতিহাসের পাতায় আজো জ্বলজ্বল করছে। যুবক-তরুণীরা যেদিকে যায় দেশের চাকা সেদিকেই অবচেতনে কাত হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে এ বয়সের যুবক-যুবতিদের দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে অধিকাংশ অন্যায়-অস্থিরতা। যুবকরাই সমাজে নানা ভয়ঙ্কর অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তাদের রক্তচক্ষুর কাছে মানবতা অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সভ্যতা, ভদ্রতা, নৈতিকতার বালাই থাকে না তাদের কারো কাছে। সন্তানহারা মা, স্বামীহারা স্ত্রী, ভাইহারা বোন কিংবা পিতৃহারা সন্তান তাদের সামনে মরণবিলাপ করলেও তাদের পাষাণ দিল গলে না।

ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় কারণেই যৌবন বয়সটি সোনার চেয়েও দামি। পারস্যের এক বিখ্যাত কবির ভাষায় 'যৌবনকালের তওবা নবীচরিত্রের নামান্তর।' আর এ কারণেই তাদের এই মূল্যবান বয়সটিকে নিয়ে এক শ্রেণির মানুষ নামের অমানুষ ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে থাকে। দেশ ও জাতিকে আদর্শশূন্য তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করতে তাদের কাছে এই বয়সের যুবক-যুবতিরাই প্রধান টার্গেট। এ অসাধু মহল তাদের অব্যাহত অপতৎপরতায় অসংখ্য যুবক-যুবতিকে ফাঁদে ফেলতে সক্ষমও হয়েছে। তারা এদের হাতে বইপুস্তকের বিপরীতে তুলে দেয় অস্ত্র। ফলে তাদের বখে ও উচ্ছন্নে যাওয়ার ভয়াবহ চিত্রে প্রকৃত সমাজদরদি মানুষগুলো স্বীয় অন্তরের গহীনে এক অদেখা ব্যথা অনুভব করেন। তারা খুঁজতে থাকেন সত্য সুন্দর তারুণের মুক্তির পথ। এমনই একজন সমাজহিতৈষী দরদি লেখক ড. শায়খ আলী তানতাবী রহ.।

সাহিত্যজগতে শায়খ আলী তানতাবী এক সুপরিচিত নাম। তিনি বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যাকাশের এক ধ্রুবতারা। সময়ের বাস্তব

চিত্রগুলো নিপুণ আলপনায় তুলে ধরেছেন কলমের সাহায্যে। সে সময়কার বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তাঁর দেয়া পাঠকের নানা প্রশ্নের জবাব সুবিখ্যাত 'আল আইয়াম'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হয়। মিসরসহ বিশ্বব্যাপী সেগুলো ব্যাপক সাড়া জাগায়। আমরা মনে করি, ঘুণেধরা সমাজের পচনরোধে এসব জ্যোতির্ময় রচনা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালনে দারুণ সহায়ক হবে।

আর এই অনুরতি থেকেই ইন্টারনেট, আর্কাইভ, উইকিপিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমের জ্ঞানসমুদ্রে দুঃসাহসিক সাঁতার কাটতে চেষ্টা করি। তাঁর রচনাসাগর হতে সূচাগ্রে পানির ক্ষুদ্র ফোঁটার মতোই যুবক-যুবতিদের উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর সংকলন করি। এরপর সেগুলোকে বাংলা ভাষাভাষি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে বঙ্গানুবাদে হাত দিই। এক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ অপেক্ষা ভাবানুবাদই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাসঙ্গিকতার কারণে অন্য কয়েকটি লেখাও এতে সন্নিবেশ হয়েছে। মহাশ্রদ্ধেয় শায়খ আলী তানতাবী রহ.-এর একটি লেখার শিরোনাম তুলে ধরেই এ সংকলন সম্ভারের নাম দিয়েছি 'লাভ ম্যারেজ'। আশা করি ভিন্ন স্বাদের এই লেখাগুলো সত্যসন্ধিৎসু পাঠক মহল বিশেষত যুবক-যুবতিদের প্রাণের খোরাক যোগাবে।

বাংলাদেশের খ্যাতিমান ও পরিশীলিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'বইঘর'-এর স্বত্বাধিকারী চিন্তাশীল লেখক বন্ধুবর এসএম আমিনুল ইসলাম 'লাভ ম্যারেজ'কে প্রকাশনার আলোয় আনার উদ্যোগ নেয়ায় আমি তার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন– এই দোয়া করি।

ব্যক্তিগত ব্যস্ততা, সময় স্বল্পতা ও মেধার দৈন্যতার দরুন হয়তো মূল লেখকের মতো আবেগের উচ্ছ্বাসটাকে যুৎসই করে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দূরদৃষ্টিতে কোনো ছন্দপতন পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে সকল প্রকার অসঙ্গতি আমারই অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে; মূল লেখকের নয়। তবে যে কোনো ধরনের গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ।

–এসএম আনওয়ারুল করীম

প্রকাশকের কথা

যুবক-যুবতিরা দেশ ও জাতির মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের সদ্ব্যবহার যেমন দেশ ও জাতিকে উন্নতির চরম উৎকর্ষে আরোহণ করায় তেমনি তাদের পদস্খলন দেশকে নিয়ে ছাড়ে রসাতলে। তাই নিজেদের প্রয়োজনেই এই সম্পদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেকের কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, আমরা নিজের দেহের সুস্থতার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সমাজদেহের রুগ্ণতা নিয়ে অনেকেই ভাবার ফুরসৎ পাই না। আর এ কারণেই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ অবক্ষয়ের কালো থাবা বিরাজমান।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, আমাদের সমাজের পরিবেশ বিষিয়ে ওঠার পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুবসমাজ দায়ী। যুবক-যুবতিদের বেপরোয়া চলাফেরা, সহাধ্যয়ন, অবাধ মেলামেশাই নৈতিকতার দেয়ালে শেষ পেরেক ঠুকছে। ফলে উদ্গীরণ হচ্ছে অশান্তির বিষবাষ্প। তাদেরকে এ ভয়াবহতা থেকে উদ্ধার করে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনার সুমসৃণ পথ আবিষ্কার করেছেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক শায়খ ড. আলী তানতাবী রহ.। তাঁর সেই বিচ্ছিন্ন মুক্তাদানাকে একত্র করে 'লাভ ম্যারেজ' শিরোনামে ভিন্ন স্বাদের মালা গেঁথেছেন দক্ষ অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা এসএম আনওয়ারুল করীম। আল্লাহ তায়ালা তার এ মেহনত কবুল করুন– এই দোয়া করি।

বিষয়ের আবেদন ও অপরিহার্যতা বিবেচনায় আমরা 'বইঘর'-এর পক্ষ হতে 'লাভ ম্যারেজ'কে সত্যানুরাগী পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এটি তারুণ্যজীবনে সামান্য আদর্শের ঝিলিক জাগালেও আমাদের প্রয়াস সার্থক মনে করব।

–এসএম আমিনুল ইসলাম

সূ চি প ত্র

এই প্রেম সেই প্রেম

মিসরেরর বিখ্যাত পত্রিকা 'আল আইয়াম'। যুগ-সমস্যার নির্ভুল সমাধানের কারণে ইতোমধ্যেই এটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ কারণে আল আইয়াম'র কাছে পাঠকের প্রত্যাশাও ব্যাপক। আল আইয়ামও কাউকে নিরাশ করে না। সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববানরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সময়োপযোগী সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন। এ পত্রিকাটির প্রধান কর্ণধার এক যুগশ্রেষ্ঠ গবেষক। যিনি ইতোমধ্যেই সাধারণ জনগণের আস্থার প্রাণপুরুষে পরিণত হয়েছেন। তিনি শায়খ ড. আলী তানতাবী রহ.। তিনি আজ জীবিত নেই। কিন্তু তার সৃষ্টিকর্ম তাবৎ দুনিয়ার পথপ্রদর্শক হিসেবে আজো সমানভাবে সমাদৃত।

তার নিজের ভাষায়ই শুনুন–

আল আইয়াম কার্যালয়ে প্রতিদিন এমনসব ফতোয়া, জিজ্ঞাসা আর প্রশ্ন আসে যার দরুন ঝিমিয়ে পড়া মস্তিষ্ক সচকিত হয়ে ওঠে। অবসাদগ্রস্ত মেধা হয়ে ওঠে চঞ্চল। পাঠকের পক্ষ হতে আগত প্রশ্নগুলো লেখককে বাধ্য করে চিন্তা সক্রিয় করতে। বাধ্য করে কলম সঞ্চালন করতে। কারণ পাঠকের ভাবনার ফলাফল ও কলমের ফসলই যে ঝিমিয়ে পড়া জাতির প্রাণ!

প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় আমার হাতে যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো আমি দেখার জন্য উদগ্রীব থাকি। আজো তার ব্যতিক্রম হলো না। হ্যাঁ, আমার অপেক্ষার অবসান ঘটল। আমার হাতে এলো একরাশ প্রশ্নের ডালি। প্রতিদিন আমি হাভাতের মতোই প্রশ্নগুলো গিলতে চেষ্টা করি। আজো তাই। হাতের নাগালে আজ যে প্রশ্নগুলো এসেছে তার মধ্যে প্রথমটি বিয়ে সংক্রান্ত।

প্রথম প্রশ্নটি হলো, বিবাহ কি শুধু প্রেমের ওপর নির্ভর করে সংঘটিত হওয়া সম্ভব? একই চিরকুটে লেখা দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, বিয়ের বয়স-সংক্রান্ত।

দ্বিতীয় সেই প্রশ্নটি হলো, পুরুষের জন্য কখন বিয়ে করা উত্তম?

প্রশ্ন দুটি হাতে পেতেই আমার মনের মাঝে উত্তর উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। আমি উত্তরের মহাসমুদ্রে তলিয়ে যেতে থাকি। হাতড়াতে থাকি অতলান্ত। সিন্ধু সেচে মুক্তা আনার মতো আমার মনের রাডারে ধরা দেয় বেশ কিছু উত্তর। কিছু জবাব ছিল বেশ আশ্চর্যরকম।

ব্যক্তিগতভাবে আমি 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল' নীতিতে বিশ্বাস করি না। একাকী জীবনকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। তবে হ্যাঁ, একাকিত্ব দূর করতে কারো সাথে তর্ক করা কিংবা তার মুখের ওপর উত্তর দেয়াও আমি একদম পছন্দ করি না। যে মত আমি পোষণ করি, সে মতই কেবল ব্যক্ত করি। কেউ আমার ওপর নির্ভর করলে কিংবা আমার মতের অনুসরণ করলে তো ভালোই। পক্ষান্তরে কেউ আমার বিরোধিতা করলে, আমাকে না মানলে তার ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাস্য নই। কারণ আমি তো তার বাধ্যতামূলক অভিভাবক নই যে, আমার কথা তাকে শুনতেই হবে!

এবার আমার উত্তর দেয়ার পালা। মনের হাঁড়িতে যেই উত্তরটি রান্না হচ্ছিল সেটিই উগড়ে দেয়ার নিরন্তরতা আমাকে কুড়ে খাচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমি বুঝতে চাই যে, কোন প্রেম সম্পর্কে তোমরা জানতে চাচ্ছ?

মনে রেখ যে, আল্লাহ মানুষকে দুটি সহজাত বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি হলো, নিজেকে টিকিয়ে রাখার বাসনা। আরেকটি হলো, স্বজাতিকে টিকিয়ে রাখার বাসনা।

প্রথম বাসনাটির দরুন ক্ষুধার তাড়না খাবার অনুসন্ধানে বাধ্য করে। যেন তৃপ্তি সহকারে আহারের মাধ্যমে নিজের মৃত্যু ঠেকাতে পারে।

দ্বিতীয় বাসনাটির দরুন কামনার দহন তাকে নারীর সান্নিধ্যে টেনে নিয়ে যায়। যেন বংশ বিস্তারের মাধ্যমে আপন প্রজাতির নির্মূল রোধ করতে পারে।

এবার তোমাদেরকে ভাবনার একটি ছোট্ট গলিতে নিয়ে যেতে চাই। সেটি হলো, ভেবে দেখ তো– কখনও তোমার জীবনে এমন হয়ে থাকবে যে, রেস্তোরাঁয় গিয়েছ। তোমার সামনে খাবার হাজির। পকেটে পয়সা-কড়িও আছে। ব্যাস! অর্ডার দিতেই খাবার হাজির হয়ে যাবে তোমার সামনে। এর বিনিময়ও অবশ্য আছে তোমার কাছে। তোমার সাধ্যের মধ্যে যত অর্ডার কর সবই তোমার জন্য বৈধ। এর কল্পনা করতে গিয়ে কিন্তু কখনও কেউ মাথা খাটাও না। এর জন্য অপেক্ষা করে কেউ নিজের দেহ-মন ক্লান্তও কর না।

আবার কখনও এমন হয় যে, পেটে ক্ষুধা আছে বটে; কিন্তু সময়মতো খাবার থাকে না। এ সময় যতই ক্ষুধার তিক্ততা ভোগ কর ততই তোমার কল্পনায় খাবারের স্বাদ বাড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, এভাবে দীর্ঘ সময় গেলে এ কল্পনা স্থায়ী হয়ে যায়। তখন তোমার কল্পনা তাতেই নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। তোমার ঝোঁক থাকবে শুধু সে দিকেই। এই ঝোঁক সেদিক থেকে ফিরিয়ে আনা মহামুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

এবার শোন, যখন দেহে যৌনক্ষুধা থাকে আর বিপরীতলিঙ্গ থাকে অনুপস্থিত, তখন তা নিয়ে তোমার কল্পনা খাবার নিয়ে ক্ষুধার্তের কল্পনারই মতোই। এ জিনিসটিকেই আমরা বলি ভালোবাসা।

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যখন খাবার খোঁজে, তখন খাবারের রং আর ধরন নিয়ে ভাবে না। যৌনক্ষুধাটাও তেমন! এ ক্ষুধা পেয়ে বসলে ধনী-গরিব, কাঙাল-অনাথ, কালো-ধলা, জাত-মানের বাঁধ মানে না।

যৌনক্ষুধায় আক্রান্ত ব্যক্তির আগ্রহ কখনো নির্দিষ্ট কোনো নারীর ওপর স্থির হয়ে গেলে সারা পৃথিবী তখন সেই নারীর মাঝে সীমিত হয়ে যায়। সে তাকে দেখতে চায়, কথা বলতে চায়। সে কি নারীটিকে দেখে তৃপ্ত হয়? তোমার কি মনে হয়, সে কথা বলে তুষ্ট হবে?

না! সে তাকে ভোগ করার আগ পর্যন্ত তুষ্ট হতে পারে না। কারণ সে তো ক্ষুধার্তের মতোই। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির পক্ষে কি খাবার দেখলে, খাবারের ঘ্রাণ নিলে, খাবার নিয়ে কবিতা আর ছন্দ গাঁথলে যথেষ্ট হয়? তাতে কি তার পেটের ক্ষুধা নিবারণ হয়?

হে আমার প্রাণস্পন্দন ছেলেরা! আল্লাহর শপথ, কখনোই না। সে শুধু সৌন্দর্য চায় না। সে কান আন্দোলিত করা কথা চায় না। সে তার চাবির জন্য চায় তালা। এ হলো আপন প্রজাতির প্রতি সহজাত বাসনা। এ বাসনা বংশ বিস্তার ছাড়া তৃপ্ত হয় না।

মনে রাখবে, প্রেম শুধু যৌন সম্পর্কের আগ্রহেরই নাম। কবিরা যতই প্রেমকে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করে উপস্থাপন করুক– ভদ্র ও নিষ্কাম প্রেম হলো ফালতু কথা। এর সমাদর শুধু পাগল আর যুবকদের কাছে। যুবকরা তাদের মনের আবেগের লাগামটিকে টেনে ধরতে পারে না।

এটাই বাস্তবতা যে, কেউ অস্বীকার করলে প্রতিউত্তর সে নিজের কাছেই পেয়ে যাবে। এর বাস্তবতার সব প্রমাণ তাদের মনের গহীনেই লুকিয়ে আছে। অস্বীকার করার কোনো পথ নেই। এরপরও কি শুধু প্রেম বিবাহের ভিত্তি হতে পারে? না, পারে না।

মূলত প্রেম হলো মন-সংশ্লিষ্ট ক্ষুধার নাম। পেট যখন ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করে, তখন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কি খাবার ভালো-মন্দের বাছ-বিচার করতে পারে? ক্ষুধা কি তার সামনে গুটিবসন্তে আক্রান্তকে সুসজ্জিত করে তোলে না? ফলে গুটিবসন্তে আক্রান্তের মাঝেই খাসা বকরির স্বাদ খুঁজে পায়। যখন ক্ষুধার তাড়না শেষে ফিরে আসে গুটিবসন্ত হয়ে; তখন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যে, সে তো ছিল ক্ষুধার কল্পনায় সৃষ্ট খাসা বকরি! তখন তার ভুল ভাঙ্গে। কিন্তু তখন ভুল তার কূল ফিরিয়ে দিতে পারে না।

প্রেমিকার বিষয়টিও এমনই। প্রেমের দরুন প্রেয়সীকে নিয়ে প্রেমিক গড়ে তোলে এক রঙিন পৃথিবী। সে গড়ে তোলে এক স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য। সেই রাজ্যে বিচরণ করেই সে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়। শাদা বলাকার মতো উড়াউড়ি করে তার স্বপ্নগুলো। কল্পনার সোনালি গায়ে সে চড়ায় ঝলমলে পোশাক। ফলে প্রেয়সীকে দেখে সবচেয়ে সুন্দর মানবীরূপে।

কিন্তু হায়! প্রলুব্ধ করা সেই পোশাকাবৃতা প্রেয়সীকে বিয়ে করার পর একপর্যায়ে পোশাকটি যখন খুলে যায়, তখন আর বিবাহ বন্ধন থাকে না। কারণ, সে তো মেয়েটিকে বিয়ে করেনি; বিয়ে করেছে পোশাকটিকে। বিয়ে করেছে তার কল্পনা যে পোশাকটি মেয়ের গায়ে পরিয়েছিল তাকে।

বস্তুত যুবক-যুবতির প্রেম হলো, যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা শেষ হলে তাদের প্রেমও শেষ হয়ে যায়। তখন প্রেমপাগল মজনুর হুঁশ ফিরে আসে। লায়লা তখন তার চোখে অন্য সাধারণ নারীর মতোই ধরা দেয়। পেট ভরে গেলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি যেমন কোনো আগ্রহ থাকে না তখন মেয়েটির প্রতিও আর কোনো আগ্রহ থাকে না।

প্রেম এক সাময়িক বন্ধন। যা প্রথম স্পর্শেই ছিন্ন হয়ে যায়। স্পর্শ বলে কী বোঝাচ্ছি আশা করি বুঝতে পেরেছ!

মনে রাখবে, বিবাহ হলো স্থায়ী সম্পর্ক। এর জন্য প্রয়োজন স্থায়ী বন্ধনের। যা স্পর্শের চেয়ে শক্ত ও দৃঢ়। দিন দিন তা আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হবে। হবে প্রাচীরের ন্যায় মজবুত।

আমি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে চেষ্টা করেছি। আমি প্রেমনির্ভর বিবাহ বিষয়ে বড় বড় সাহিত্যিকের অসংখ্য গল্প পড়েছি। এর সবগুলোর পরিণতি শুনলে হয়তো তোমরা আশ্চর্য হবে।

তোমাদের চোখ তো রঙের ফানুস! তাই আমার অভিজ্ঞতার কথাগুলো বিশ্বাস করবে কিনা, তা নিয়ে আমি সন্দিহান। সত্যি কথা হলো, এসব বিবাহের পরিণতি হলো বিবাদ ও বিচ্ছেদ।

তোমরা ওয়ার্দার, রাফায়েল, মাজদুলানী, বোল, ফারজিনী, ক্রাজিলা, জোসলান ও ভাঙ্গা ডানাদের বিরহ বেদনায় প্রতারিত হয়ো না। এসবই দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত আলোচনার একটি আগ্রহচিত্র। এসবের নায়করা যদি প্রেয়সীকে শুধু প্রেমের কারণে বিয়ে করত, তাহলে গল্পের সমাপ্তি ঘটত; তালাক দিয়ে শেষ করতে হতো না।

আমি বিশ্বাস করি যে, বিয়ের ভিত্তি শুধু প্রেমের ওপর হতে পারে না। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ○

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। *[যুমার : ৬২]*

অতএব মানুষ ইচ্ছে করলেই সব কিছু পেতে পারে না। মানুষ তার হাত দিয়ে আকাশ ছুঁতে চায়। কিন্তু পারে কি? তবে হ্যাঁ, হতেও পারে। যদি বিশাল প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করা যায় পানির প্রবাহে লবণের ওপর, তবেই সম্ভব বিবাহের ভিত্তি প্রেমের ওপর। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই প্রেমনির্ভর বিবাহ সুখময় হওয়াও অসম্ভব।

বিবাহের ভিত্তি হলো, ভাবনা ও আচরণের মিলনের ওপর। বিবাহের ভিত্তি গড়ে ওঠে সামাজিক নিয়ম ও আর্থিক অবস্থার ওপর। এসবের পরে আসে আবেগ। বর কনে দেখবে, কনে বর দেখবে। অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবক বা মুহাররামের উপস্থিতিতে ছেলে শুধু মেয়ের চেহারা আর হাত দেখবে। তালগোল পাকিয়ে ফেলা কথিত শায়খ বাকুরীর ফতোয়ার মতো নয়। মনে রাখবে যে, আল্লাহ মহান। তিনি আসমান ও জমিনের মালিক। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

তাঁর মর্যাদা হলো সমগ্র সৃষ্টি তাঁর দাসত্বে নিয়োজিত। সবাই তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সবই তাঁর আয়ত্তাধীন এবং সব কিছুর ওপর তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

তাই যুবক-যুবতির মাঝে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টির মালিকও তিনি। এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন, তাহলে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে এ আকর্ষণ পরিণত হয় স্থির ও স্থায়ী ভালোবাসায়। আর যদি তাদের মাঝে অনাগ্রহ ও অনিচ্ছা জন্ম নেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা একজনের কাছে আরেকজনের প্রয়োজন আর রাখবেন না। এই আকর্ষণকে আল্লাহ তায়ালাই মনোরম করে দেন। এতে বইতে থাকে

প্রশান্তির আবে হায়াত। এ আবে হায়াতে অবগাহন করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে গড়ে ওঠে অনাবিল, অনিন্দ্য ও নির্মল প্রশান্তি।

আসল প্রেম নকল ভালোবাসা

সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণ নিয়েই মানুষের জীবন। জীবনে কখনো সমস্যায় পড়েনি— এমন মানুষের সংখ্যা পাওয়া খুবই মুশকিল। এমনকি পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনে কোনো না কোনো সমস্যায় পতিত হয়েছেন। তাই বলা যায়, সমস্যা মানবজীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ। তবে হ্যাঁ, সমস্যার ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিছু সমস্যা থেকে সহজেই উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। আবার কিছু সমস্যার সমাধান জটিল ও দুরূহ।

বর্তমান সমাজের অন্যতম জটিল ও মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে বৈবাহিক সম্বন্ধ। উম্মাহর বাস্তব ও সামাজিক জীবনে এর জটিলতা প্রকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। চলমান এই জটিলতাকে এক কথায় বলা যায়— আমাদের আদুরে কন্যাদের বিয়ের বয়স হওয়ার পরও প্রস্তাব আসে না! রক্ষণশীল যুবকরা তাদের উপযোগী মেয়েদের খুঁজে পায় না! কিংবা তারা বিয়েই করতে চায় না!!

এই জটিলতার আকার ও ব্যাপ্তি একেকটি ভিন্ন ধরনের। আপনারা এই জটিলতার আকার ও ব্যাপ্তি একটু অনুভব করার চেষ্টা করুন। কিভাবে অনুভব করবেন তাও আমি বলে দিচ্ছি। তাহলো একটি কলম আর একটি খাতা নিন। এরপর মাথাটাকে একটু ঘুরান। মনে চাইলে চোখ বুজে ভাবতে থাকুন। যেসব পরিবারে অবিবাহিত কন্যারা রয়েছে এবং যেসব ঘরে অবিবাহিত যুবকরা রয়েছে, তাদের নামের তালিকা করুন। তাহলে দেখতে পাবেন আপনাদের পরিচিতদের মধ্য হতেই দশটি কন্যা ও দশটি যুবক বেরিয়ে আসবে।

পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ..

তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও বেঁচে থাক, গোপন গুনাহ থেকেও বেঁচে থাক; নিঃসন্দেহে যারা কোনো গুনাহের কাজ করবে, তাদের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তাদের প্রদান করা হবে। *[আনআম : ১২০]*

আমার আজকের আলোচনার বিষয় তিনটি। এই জটিলতার কারণ, ফলাফল নির্ধারণ ও এ থেকে উত্তরণের পথনির্দেশনা প্রদান।

বৈবাহিক জটিলতার ফলাফল খুবই মারাত্মক। এই নৈতিক বিপর্যয়ের অভিযোগ প্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলোতে বসবাসরত প্রায় সব জনগণই করে থাকে। আমি স্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। কারণ। সরাসরি কারও সাথে এ নিয়ে কথা বলতে পারছি না।

আমার সামনে এ ধরনের কোনো লোকের উপস্থিতিও নেই। তাই তাদের রুচি, চেতনা, মানসিকতা ও মননশীলতা বোঝার উপায়ও নেই।

আমি রেডিও সেন্টারে বসে কথা বলছি। এখান থেকে বিভিন্ন প্রান্তে ইথারে ছড়িয়ে যাবে আমার কথা। কিন্তু আমার জানা নেই যে, কারা আমার কথা শুনছেন। হয়তো শ্রোতাদের মধ্যে যুবক ও যুবতি রয়েছে। হয়তো এমনও অনেকে রয়েছেন, যারা এ জাতীয় আলোচনা সরাসরি শুনতে অপছন্দ করেন।

এ কারণে শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হারাম করেছেন, তার বিপরীতে আরেকটি বস্তু হালাল করেছেন। যেমন সুদ হারাম করেছেন পক্ষান্তরে ব্যবসায় হালাল করেছেন; যেনা হারাম করেছেন পক্ষান্তরে বিবাহকে করেছেন হালাল। সুতরাং যে ব্যক্তি নকল তথা হারাম প্রেম পরিহার করে আসল প্রেম তথা হালাল পথ বর্জন করবে তার জন্যে কার্যসিদ্ধি ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের হারাম পথটিই শয়তান খুলে দেয়।

বৈবাহিক সম্বন্ধের স্বল্পতার কারণে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে ফল বেরিয়ে আসে, তা হলো বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার আধিক্য। এই নৈতিক অধঃপতন থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো বিয়ে-প্রথার সহজায়ন। কিন্তু আমরা বৈবাহিকব্যবস্থাকে মারাত্মক জটিল করে থাকি। ফলে এর ইতিবাচক ফলাফল আমাদের হাতে ধরা দেয় না। আমরা আসল প্রেমের সাথে নকল ভালোবাসাকে গুলিয়ে ফেলি। ফলে কোনটি আসল আর কোনটি নকল ফানুস তার পার্থক্য করাই হয়ে পড়ে দুরূহ।

আই লাভ ইউ

দু'দিন আগের ঘটনা। আমাদের এক আত্মীয় যুবক আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। দেখতে বেশ তাগড়া। তার দৈহিক গঠন ভালো। সুস্বাস্থ্যবান। নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও পিছিয়ে নেই। বয়স ত্রিশের কোটা ছুঁইছুঁই। তবে বেচারা এখনও বিয়ে করেননি।

কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আরে! তুমি বিয়ে করছ না কেন?

জবাবে সে যা বলল তাতে আমার টাসকি খাওয়ার মতো অবস্থা। সে জানাল যে, বিয়ের ব্যাপারে আমি আমার পরিচিতজনের অনেকের সাথেই আলাপ করেছি। ব্যাপারটি নিয়ে পরিচিত ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব যার সাথেই কথা বলেছি, তারা সবাই আমাকে বৈবাহিক জীবনে অশান্তি, কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, বউ-শাশুড়ির অমিল ইত্যাদির শত অভিযোগ শুনিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছে যে, বিয়ে না করাই ভালো ছিল। আমি তাদের কথায় বুঝলাম যে, এ যুগে বিয়ে করার অর্থ মাথাব্যথা ও হৃদরোগ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই না। অতএব আমি নিজের কষ্টার্জিত অর্থে মনোবেদনা ও জীবনযন্ত্রণা কিনতে চাই না।

আমি আমার সেই আত্মীয় যুবককে বললাম, আরে! তোমার যে বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞেস করেছ, তারা অবশ্যই মানুষ হবে নিশ্চয়?

জবাবে সে বলল, আরে! মানুষ না হলে কি আর নিজেদের দাম্পত্যজীবনের কষ্টটা বুঝতে পেরেছে?

আমি তাকে বললাম, তারা কষ্ট ও ব্যথায় আছে বলে সবারই কি একই দশা হবে?

জবাবে আমার আত্মীয় কাচুমাচু করতে লাগল।

আমি সুযোগ বুঝে তাকে বললাম, আচ্ছা! তুমি তাদের জিজ্ঞেস করলে! অথচ আমার কাছে জিজ্ঞেস করলে না কেন? যে ব্যক্তি পাঁচ-দশটি মজলিসে হাজির হয়ে বৈবাহিক বিবাদ মীমাংসা করে, এ সম্পর্কে অবশ্যই তার জ্ঞান মন্দ হওয়ার কথা নয়। তাই কাচারি এক জায়গায় রেখে অন্যত্র গিয়ে কান ডললে কি সমস্যার সমাধান হবে? বরং এটাতো অরণ্যে রোদন বৈ অন্য কিছু নয়!

আমার কথায় আমার আত্মীয়ের আত্মসম্মানে হালকা আঘাত লাগল। ব্যাপারটি আমি আঁচও করলাম।

আমি তাকে বললাম, শোন! আমি কোর্টে ত্রিশ হাজারেরও অধিক দম্পতির সমস্যার সমাধান করেছি। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা শুনেছি। বহু লাভ ম্যারেজ সমস্যার সমাধান করেছি। তাছাড়া আমি ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে নিয়োজিত এক ব্যক্তি। একটা সময় এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তখন লেখালেখিতে প্রবেশ করিনি। সে সময়ে বিধবাদের জন্যে প্রশিক্ষণশালা খুলেছিলাম। তাই আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি

একেবারে ঠুঁটো নয়। আশা করি আমার সম্পর্কে তোমারও তো কম-বেশ জানা আছে। তা সত্ত্বেও তুমি আমার সাথে পরামর্শ করলে না কেন?

জবাবে ত্রিশের কোটায় করাঘাতকারী যুবক বলল, আচ্ছা! আপনি কি দেখেন না, অধিকাংশ দম্পতির জীবনে সব সময় অশান্তি লেগে থাকে?

আমি তাকে বললাম যে, আমি তোমাকে প্রথমে দম্পতি-বিবাদের মূল রহস্য বোঝানোর চেষ্টা করব। বিবাদের কী অর্থ তাও বোঝা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতানৈক্যকে বিবাদ বলা যাবে না। কারণ এটা সম্ভব নয় যে, জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত শুধু আনন্দ করবে। লাইলি-মজনুর মতো প্রতিদিন প্রেমালাপ করাও সম্ভব নয়।

'তাহলে আর কি!'– যুবক জানতে চাইল।

জবাবে আমি বললাম, শোন! ভালোবাসার মিলন মানেই কি কেবল সে তোমাকে বলবে– 'আই লাভ ইউ!' তথা 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'! আর তুমি তাকে বলবে– 'আই লাভ ইউ টু! তথা তোমাকেও আমি ভালোবাসি'? এভাবে যখন একই শব্দ বারবার বিনিময় হতে থাকবে? তখন তো এ শব্দের আর কোনো অর্থই থাকবে না। মনে রাখবে বর্তমান পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত শব্দ হলো এই 'আই লাভ ইউ'। কিন্তু ব্যবহারের আধিক্যে এটি এখন সবচেয়ে বেশি হওয়ায় এটি এখন মুখের বুলিতে পরিণত হয়েছে। এটি এখন কথার কথা। এখন যে শিশুটির মুখে কথা ফুটতে শুরু করে, সেও তার বড়দের মুখে শুনে 'আই লাভ ইউ' বলতে থাকে। আচ্ছা, দুই বছরের এই শিশুটি আই লাভ ইউ'র কী বোঝে?

মূলত ছোট বাচ্চারা এমনই ভাবে। যদি এই শব্দগুলোর মাঝেই লাইলি-মজনুর দাম্পত্য সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে বিয়ের দ্বিতীয় মাসের শুরুতেই তাদের বাদানুবাদ লেগে যেত। তৃতীয় মাসে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই শুনতে পেত। আর বছরের শেষ প্রান্তে এসে শরয়ী আদালতে বিচ্ছিন্নতার দাবি উঠত। তাহলে জগতের কোথাও এমন শূন্যসার বৈবাহিক জীবন সম্ভবপর হতো না। কেবল গল্প-উপন্যাসেই স্থান পেত।

যুবকটি বুঝতে শুরু করল। সে বলল, ব্যাপারটি তো এভাবে ভাবিনি!

আমি তাকে বলতে লাগলাম, স্বামী-স্ত্রী মাঝে-মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ করতে পারে। একজন আলেমের পরিবারেও এ ধরনের বিবাদ হয়ে থাকে। এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেও এ জাতীয় মতভিন্নতা হতো। অথচ তাঁর পরিবার ছিল জগতের শ্রেষ্ঠ পরিবার।

যুবকটি যেন আমার কথাগুলোকে গো-গ্রাসে গিলতে লাগল।

আমিও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করিনি। আমি তাকে বললাম, আমার কথা বিশ্বাস না হলে সূরা তাহরীম পড়ে দেখুন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে নবীজীর দরবারে অভিযোগ দায়ের করতেন।

'ব্যাপারটি একটু খুলে বলুন তো!'– যুবক আব্দার জানাল।

আমি উদাহরণ দিয়ে বললাম, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা)-এর কাছে স্বীয় স্ত্রীর ব্যাপারে নালিশ নিয়ে হাজির হলেন। যখন তিনি দরজায় করাঘাত করলেন, তখন ঘরের ভেতর হযরত ওমরের স্ত্রীর উচ্চ আওয়াজ শুনতে পেলেন। আগন্তুক ব্যক্তি লক্ষ করলেন যে, হযরত ওমর নীরব আছেন। অথচ নেতৃস্থানীয় লোকেরা পর্যন্ত তাঁর নাম শুনে কেঁপে উঠত!

এরই মধ্যে লোকটি চলে যাচ্ছিল।

হযরত ওমর (রা) ঘর হতে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাকে ডাক দিলেন। লোকটি ফিরে এসে জানাল যে, আমীরুল মুমিনীন! আমি আমার স্ত্রীর অসদাচরণের অভিযোগ করতে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখি আপনিও আমার মতো ভুক্তভোগী!

জবাবে হযরত ওমর হেসে দিয়ে বললেন, এসব সহ্য করে নিতে হয়। কারণ আমার ওপর তারও অধিকার রয়েছে!

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা একই আকৃতি দিয়ে দুটি মানুষকে সৃষ্টি করেননি। এমনকি যমজদেরও না। কখনও কখনও তাদেরকে একই রকম মনে হলেও তাদের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। ঠিক তেমনি একই স্বভাব-চরিত্র দিয়েও মহান আল্লাহ কাউকে সৃষ্টি করেননি।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। *[সূরা আল-আহযাব : ৩৬]*

যদি দু'জন বন্ধু, পার্টনার, শরিকদার, ব্যবসায়ী বা স্বামী-স্ত্রী চায় যে, তাদের মাঝে বিরোধ না হোক; তাহলে একজনকে অবশ্যই অন্যের মত মেনে নিজের মতের বিরোধিতা করতে হবে।

আপনি যদি রাস্তার ডান পাশে থাকেন আর আপনার বন্ধু থাকে বাম পাশে এবং দু'জনে মোসাফাহা করতে চান, তাহলে একজনকে রাস্তা পার হয়ে আসতে হবে। নতুবা হয় দু'জনই দু'পাশ থেকে এগিয়ে এসে মাঝ রাস্তায় মিলতে হবে।

মনে রাখবেন, প্রতিটি অংশীদারি কাজে একজন কর্তা থাকা জরুরি। বৈবাহিক জীবনে অবশ্যই কর্তা হবেন স্বামী। তাই যেকোনো ব্যাপারে তার মতের অগ্রাধিকার থাকবে। ছোটখাট বিষয় হলে আলাদা কথা।

অন্যদিকে ঘর গোছানো, খাবার আয়োজন করা ইত্যাদি কাজে অবশ্যই স্ত্রীর মতামত অগ্রগণ্য থাকবে। কারণ, এটি তার অধিকার। সে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর মতো তারও সাধারণ ও ব্যাপক অধিকার রয়েছে। এখন যদি স্ত্রী অপরিচ্ছন্ন হয়, ঘর-দুয়ার পয়ঃপরিষ্কার করে না রাখে অথবা ভালো রান্নাবান্না করতে না পারে তাহলে স্বামী এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করবে।

অনেক লোক আছে, যারা ঘরের সৌন্দর্য, মেঝের চাকচিক্য ও বারান্দার পরিচ্ছন্নতার প্রতি কোনো খেয়াল করে না। তারা চায়, স্ত্রী কেবল তাদের জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকবে। তাদের মতের অনুকূলে মত প্রকাশ করবে। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যেতে প্রস্তুত থাকবে।

কিছু কিছু মহিলাও এমন আছে, যারা নোংরা জীবন যাপন করে। এখানে ওখানে জামাকাপড় পড়ে থাকে! বিছানাটা থাকে এলোমেলো! চেয়ারটা থাকে উল্টানো! রাতের থালাবাসন সকালেও ধোয়া হয় না! স্বামী কিছু বললেই চিল্লিয়ে ওঠে বয়ান ছেড়ে দেয় যে, সেই সকাল থেকে কাজ করছি, কিছু দেখছ না! আবার সাজানো-গোছানো খাটে বসলেও চিৎকার মেরে বলে, এইমাত্র ভাঁজ করলাম আর তুমি ওখানে বসে পড়লে!

মূলত প্রকৃত জ্ঞানবান নারী সে, যে সবসময় স্বামীর সন্তুষ্টি তালাশে মগ্ন থাকে। কী করলে স্বামী খুশি হবেন, তা নিয়ে ভাবতে থাকে।

ঠিক পুরুষেরও উচিত স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা। নিজের কর্তৃত্বের ধোঁকায় পড়ে তার সাথে অসদ্ব্যবহার না করা। নিজেকে পারস্যসম্রাট নওশেরওয়াঁ ভাবা ঠিক নয়।

ঐ মানুষ আদর্শ মানুষ নয়, যে কেবল আদেশ-নিষেধই চিনে। পক্ষান্তরে যা কিছু ভালো, তা শুধু নিজের জন্যে রাখে। প্রকৃত মানুষ তো হলো সে, যার ভালোটুকু থাকে পরের জন্যে আর মন্দটুকু রাখে নিজের জন্য। নিজের সুখটাকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে পারার মধ্যেই প্রকৃত ভালোবাসা নিহিত থাকে। এমন মনমানসিকতা পোষণকারীর মুখেই আসল শোভা পায়– 'আই লাভ ইউ'।

অন্যরকম যুবক-যুবতি

দামেশকে একজন লোক ছিল। সে ছিল খুবই চালাক। সে আমারও পরিচিত ছিল। সবকিছুতে সে চতুর ও ঝটপট। আশ্চর্য ও দুর্লভ গল্প শুনিয়ে মানুষকে অবাক করে ফেলত সে। অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে মানুষকে হতবাক করে দিত। মানুষ তার যেকোনো প্রোগ্রামে-আয়োজনে আনন্দের সাথে ছুটে আসত। সে যেখানে আছে সেখানে অন্য কারও কথা বলার সুযোগ থাকত না, অধিকারও না। তার অভিনব সব কাণ্ডকারখানা লোকজনকে হৃদয়ের গভীর থেকে হাসিয়ে তুলত।

কিন্তু এই লোকটিই স্বীয় পরিবারের সাথে ছিল ব্যতিক্রমী এক ব্যক্তি। ঘরের কারও সাথে তার কোনো হাসি-ঠাট্টা ছিল না। ঘরে যাওয়ার পর প্রয়োজন ছাড়া তার মুখ থেকে কথাও বের হতো না। সে ঘরে আসা মানেই এক বিপদের আগমন! সবাই আতঙ্কে থাকত তাকে নিয়ে। সবার সাথে কথার অনশন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আরেকজন লোক সম্পর্কে জানি। সে বিভিন্ন ভ্রমণে-বিনোদনে বের হলে একাই সবার খেদমত আঞ্জাম দেয়। বন্ধুরা সবাই তাঁবুতে থাকলে সে নিজেই বাজার থেকে গোশত, তরকারি, শাকসবজি নিয়ে আসে; আগুন জ্বালায়; সবার জন্যে খাবারের আয়োজন করে। একসাথে সবাই গল্পে মেতে থাকলে সে বন্ধুদের জন্যে আনন্দচিত্তে চা-কফি পরিবেশন করে। তাদের কারও কিছু প্রয়োজন হলে সে নিজেকে এগিয়ে দেয়। বন্ধুদের সেবায় নিজেকে পেশ করে।

কিন্তু নিজের বাড়িতে সে একজন অলস ব্যক্তি। পরিবারের ওপর সে শাসনের লাঠি ঘোরায়। অযথা তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রাখে। এক গ্লাস পানিও নিজের হাতে ঢেলে পান করে না। বসার চেয়ার, ঘুমানোর কাঁথাটা পর্যন্ত তাকে এনে দিতে হয়। স্ত্রী-কন্যা সবাই যেন তার দাসী! যেন তারা তার কাজের বুয়া!

আরেক ব্যক্তিকে আমি চিনি। বন্ধুদের কাছে তার চেয়ে ভালো দ্বিতীয় কেউ নেই। তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে হাদিয়া পাঠায়। উপহার-গিফট যেকোনো মুহূর্তে তাদের জন্যে প্রস্তুত থাকে। তাদের ছেড়ে নিজে একা কিছুই গ্রহণ করে না। অথচ এই লোকটি পরিবারের কাছে সুপরিচিত কৃপণ ব্যক্তি। পরিবারের সদস্যদের জন্য আবশ্যিক জিনিসপত্র এনে দিতেও তার কলজের পানি শুকিয়ে আসে।

* * *

এতক্ষণ কয়েকজন পরিচিত পুরুষের কথা বললাম। আমার পরিচিত ক'জন নারীর কথাও তাহলে বলে ফেলি।

আমি এমন কিছু নারীকেও চিনি। যাদেরকে অভ্যর্থনা বা আতিথেয়তায় রাখা হলে তাদের থেকে একটা শক্ত কথা, তীক্ষ্ণবাক্য কিছুই শোনা যাবে না। একটি মুহূর্তের জন্যেও তাদের মুখ হাসিমলিন হবে না। যে কোনো বদমেজাজি পুরুষও তাদের একটি হাসিতে সব ভুলে যাবে। তারা বাধ্য হয়ে বলবে, মাশাআল্লাহ! কী অপরূপ চাহনি! কত চমৎকার ব্যবহার! কেমন মধুময় কথাবার্তা!

কিন্তু যখনই ঐ নারীরা স্বামীর পাশে যায় তখন তাদের অবস্থা আর অবস্থায় থাকে না। স্বামীর পাশে এরা বড়ই পাষাণ। সব সময় মুখ মলিন করে রাখে; যেন আশি বছরের বৃদ্ধা! কথা বললে এমন বিরক্তি নিয়ে বলে, যেন ইংরেজদের লবণাক্ত পানি পান করেছে! তাকালে মনে হয় খেয়ে ফেলবে!

আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ নারী যখন কোনো ট্যুরে বা বিনোদনে বের হয় অথবা বাড়িতে বান্ধবী বা আত্মীয়স্বজনের আগমন ঘটে, তখন তাদের একেকজন নববধূর সাজ নেয়। তখন তারা আগেভাগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে ফেলে। সময় লাগিয়ে গোসল করে, চুলে শ্যাম্পু করে, সুন্দর সুন্দর জামা পরে, সুগন্ধি পারফিউমের বডি স্প্রে লাগায়, হাতে মেহেদি লাগায়, ক্রিম-আলতা-স্নো আরও কত কি ব্যবহার করে!

কিন্তু স্বামীর সামনে এরা থাকে এলোমেলো কেশে! তার সামনে আসে আধোয়া চেহারায়। স্বামীর কাছে এলে তাদের শরীর থেকে রসুন-পিঁয়াজের গন্ধ বেরুতে থাকে! মসলার গন্ধ থাকে গা জুড়ে।

অথচ স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক সবচেয়ে বেশি। জ্ঞান-বুদ্ধি, দীন-ধর্ম সবকিছুই বলে যে, যদি সাজতে হয় তাহলে স্বামীর জন্যে সাজবে; অন্য মানুষের

জন্যে নয়। স্বামীর পাশে উত্তম কাপড়, সুগন্ধি লাগিয়ে, সুন্দর-সুন্দর বাক্যবিনিময়ে অবস্থান করবে। মৃদু হাসি, নম্র ব্যবহার সবকিছুই স্বামীর জন্যে জমিয়ে রাখবে।

একইভাবে যুক্তি ও নীতির দাবি হলো, স্বামীর কাছে নিজ পরিবারই সর্বাধিক সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য। তারাই সেবা ও হাদিয়া পাওয়ার উপযুক্ত। হাসি-কৌতুক, সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতার সবচেয়ে বড় অংশ পরিবারের জন্যে বরাদ্দ রাখতে হবে। শুধুই অন্য মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট হতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কিভাবে যে অবস্থার পরিবর্তন হলো! নিকটের লোক হলো অশ্রদ্ধার পাত্র! পক্ষান্তরে অপরিচিত হলো শ্রদ্ধার যোগ্য!

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! এসবের মূল কারণগুলো আমি জানি।

এর মূল, প্রথম ও প্রধান কারণ হলো, কৃত্রিমতায় আমাদের সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। বাস্তব কথা হলো, আন্তরিকতা কৃত্রিমতাকে দূর করে দেয়। আর হাস্যকর কথা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ভেতরগত আচরণেও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়।

তাই কৃত্রিমতা পরিহার করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা উচিৎ। একে অন্যের কাছে নিজের দোষ-গুণ সবই জানাতে পারে। প্রতিটি মানুষের একান্ত কিছু বিষয় আছে, যা সে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। এমনকি অতি নিকটজনের কাছেও না। আরবদের প্রবাদ হলো 'অধিক নৈকট্য, পর্দা অবিচ্ছেদ্য'।

তোমার চেহারাটা প্রিয়জনের সামনে রাখ। খুব কাছাকাছি হও; যেন তার ও তোমার মাঝে এক আঙুলের বেশি ফাঁকা না থাকে। তখন কিন্তু সে তোমাকে দেখতে পাবে না; বরং নাকের স্থানে দেখবে পাহাড়ের মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। অথবা সোজা করে তুমি দুটি রেখা টানো। এরপর সেখান থেকে সামান্য দূরে রেখাদুটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখবে খুবই সোজা, কোনো বক্রতা নেই। কিন্তু যত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে; (যদি পার অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে) তাহলে দেখতে পাবে, প্রতি বিন্দু পরপর সরল রেখাদুটো এদিক সেদিক বাঁকিয়ে আছে। একই অবস্থা মানুষের ক্ষেত্রেও।

আমার একজন খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ত্রিশ বছর যাবৎ তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কোনোদিন আমি তার থেকে মন্দ কিছু দেখিনি। সব সময় আমার মতের অনুকূলে তাকে পেয়েছি। একবার তার সাথে কোথাও সফরে বের হলাম। জায়গা সীমিত থাকায় সফরের রাতে এক রুমে দু'জনের থাকতে

হলো। সেখানে তার খাওয়া-দাওয়া, অজু-নিদ্রা দেখে মনে হলো তার সাথে আমার নীতিগত অনেক বৈপরীত্য রয়েছে!

আশা করি এ আলোচনা থেকে স্বামী-স্ত্রী বেশ উপকৃত হবেন এবং যে সমস্ত যুবক-যুবতি এখনও বিয়ে করেনি, তারা বিয়েতে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

এক বেনামি যুবতির আর্তি

আজ হতে ত্রিশ বছর আগে। এক যুবতি তার মনের আকুতি মিশিয়ে আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে। বেনামি ঐ তরুণীর প্রশ্নের জবাবে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই 'মাআন্নাস' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। তাতে প্রবন্ধটি সংযুক্ত করে দিই। প্রবন্ধটিতে বিবাহ ও আমাদের নারী সমাজ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। যখন প্রবন্ধটি লিখি তখন মধ্যপ্রাচ্যে নানা দিক হতে নারীদের অবস্থা ছিল সকরুণ। তাই বইটি সেখানকার অধিবাসীদের জন্যে বেশ উপকারী হবে বলে আশা করছি।

বেনামি ঐ যুবতির পক্ষ থেকে আমার নামে ডাকে একটি পত্র আসে। চিঠিতে লেখা তার কিছু শব্দ ও বাক্য তার গুণ ও মানকে ক্ষুণ্ন করেছে। পত্রে তিনি কিছু বিষয়ে অভিযোগ তুলেছেন। আর কিছু বিষয়ের প্রশংসাও করেছেন। তার কথার কিছু অংশ পাঠকের সুবিধার্থে তুলে ধরছি–

> *দেখুন আরব্য রমণীদের সংকীর্ণ জীবন ধারণ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য রমণীদের সচ্ছল জীবনোপকরণ। এই নারীর বন্দি জীবন আর ওই নারীর স্বাধীন ভুবন।*

বেনামি যুবতির লেখা এই অংশটি পড়ে আমি থমকে যাই। শব্দগুলো আমাকে মহাতাড়নায় ফেলে দেয়। আমাকে দংশন করে বাক্যগুলো। আমি ভাবনার সাগরে হারিয়ে যাই। এক সময় আমার খেই ফিরে। আমি যুবতির চিঠির উত্তর দেয়ার সংকল্প করে ফেলি।

আমার মন বলতে থাকে যে, আরে! এই যুবতি তো ভুল ধারণায় আছে। তাকে সত্য ও সোনালি সুন্দরের পথ দেখানোর দায়িত্ব তো এখন আমার। আমি যদি তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে না দিই তাহলে নিশ্চয় আমাকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আমি মনস্থির করি। যাতে তার ভুলগুলো শুধরে দিতে পারি।

মূলত তার চিঠির জবাবই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমি ভাবতে থাকি যে, এই বেনামি যুবতির মতো আরও অনেকেই হয়তো এমন ধারণা পোষণ করে থাকে। তারা স্বীকার করতে চায় না যে, এসব হচ্ছে কেবলই ধারণা।

এই ধারণা ও মন্তব্যের সর্বসুন্দর, অর্থবহ ও সংক্ষিপ্ত জবাব সম্পর্কে আমি আমার প্রখ্যাত উস্তাদ শায়খ বাহযাতুল বায়তারের একটি জিজ্ঞাসার জবাবকে তুলে ধরতে চাই। তিনি আমেরিকা নিবাসী এক রমণীর জিজ্ঞাসার প্রতিউত্তরে কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানিয়েছেন। তিনি আমেরিকার এক সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুসলিম নারী সম্পর্কে কথা বলছিলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, অর্থসম্পদে নারীদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা রয়েছে। এখানে কারও হাত নেই। এমনকি স্বামী, বাবা কেউ তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

উপরন্তু মহিলা দরিদ্র হলে যাবতীয় খরচাপাতি ও ব্যয়ভার তারাই গ্রহণ করবে। যদি তার বাবা-ভাই কেউ না থাকে, তাহলে যারাই তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে তারা তার দায়ভার কাঁধে তুলে নেবে; যদিও সে চাচাতো ভাই-ই হয়। এভাবে ঐ পর্যন্ত তার দায়িত্বভার অন্যের হাতে সোপর্দ থাকবে– যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিয়ে না হবে অথবা সে নিজে অর্থসম্পদ উপার্জন করতে না পারবে। বিয়ে করলে স্বামী তার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেবে; যদিও স্ত্রী কোটিপতি হয়ে থাকে।

এভাবে ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদা অতি উচ্চে রাখা হয়েছে।

আমার শায়খের কথায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যশালার এক নারী দাঁড়িয়ে বললেন যে, যদি আপনাদের কাছে নারী এতই মর্যাদার হয়, তাহলে আমাদেরকেও আপনাদের ওখানে ছয় মাস রাখুন। এরপর হত্যা করে ফেলুন!

আমার শায়খ তো ভদ্রমহিলার কথা শুনে খুব আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি দরদের সাথে জিজ্ঞানুনেত্রে তার অবস্থা জানতে চাইলেন।

জবাবে মহিলা সবিস্তারে নিজের অবস্থা এবং সন্তানদের দুর্গতির কথা তুলে ধরল।

আমেরিকান ঐ মহিলা বাহ্যত নিজেকে স্বাধীনা ও সম্মানিতা হিসেবে প্রকাশ করে। অথচ সে বন্দিনি ও অপমানিতা। কারণ আমেরিকার লোকেরা নারীদের আনন্দ-আয়োজনে স্বাধীনতা দিয়ে রাখে। সেখানে সম্মান দেখায়। কিন্তু জীবনের বৃহদাংশে তাদেরকে অবহেলা করা হয়।

মূলত আমেরিকান পুরুষরা গাড়ি থেকে নামার সময় স্ত্রীদের হাত ধরে থাকে। আতিথেয়তা আপ্যায়নে তাদেরকে সামনে সামনে রাখে। কখনওবা বাসে-কারে তাদের জন্যে সিট ছেড়ে দেয়। কিন্তু এসবের বিপরীতে এমন আচরণ প্রদর্শন করে থাকে, যা সহ্য করার মতো নয়।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমেরিকায় যখনই একজন মেয়ে প্রাপ্তবয়সি হয়, তখন বাবা বা ভাই তার হাত ছেড়ে দেয়। তার জন্যে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে। তাকে বলে যে, 'যাও কাজ করে খাও। নিজের দায়িত্ব নিজে বুঝে নাও। আজকের পর তোমার জন্যে আমার কাছে চাওয়ার মতো কিছুই নেই।'

ফলে বাধ্য হয়ে এই মিসকিনা নিঃস্ব অবস্থায় পথে নেমে পড়ে। সে অবতীর্ণ হয় জীবন-সংগ্রামে। তারা এ নিয়ে সামান্য ভাবে না যে, মেয়েটি কোথায়? কী হলো তার? বেঁচে আছে, নাকি মরে গেছে? এই অবস্থা আমেরিকার এক মেয়ে বা একটি পরিবারের চিত্র নয়; বরং সারা পাশ্চাত্যে একই দুর্গতি বিরাজ করছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তরুণী

জনাবা, আপনারা পুরুষের মিষ্টি কথায় কান দেবেন না। কারণ কোনো পরপুরুষই প্রকৃতভাবে আপনার কল্যাণ চায় না। তারা আপনাকে কয়েকদিন ভোগ করে পরে টিস্যু পেপারের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিবে।

মনে রাখবেন যেই পুরুষ নারীদের উত্ত্যক্ত করে এবং নারীর জন্যে অসৎ উদ্দেশ্যে অর্থ অপচয় করে, আমাদের কাছে সে পাপাচারী হিসেবে বিবেচিত। কারণ, কোনো পুরুষ একজন নারীকে অনেক চেষ্টা-তদবিরের পরই লাভ করতে পারে। প্রাচ্যের নারীরা আচ্ছাদিত থাকে। গর্হিত কাজ কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে। এ কারণে তারা সম্মানের পাত্রী; মানুষের কামনার বস্তু নয়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের নারীরা জনসম্মুখে নিজেদের উপস্থাপন করে থাকে। ফলে তাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হয়। কেননা, জগতের যা কিছু খোলা চত্বরে প্রকাশ করা হয়, তার দাম কমে যায়। একইভাবে যেসব নারী খোলামেলা চলাফেরা করে আপনারাই তাদের সম্পর্কে নিজের বিবেককে ঠাণ্ডা মাথায় একটু খাটিয়ে দেখুন। আপনারাই ভেবে দেখুন তো আপনাদের কাছে কোন নারীর মূল্যায়ন বেশি! যারা নিজেকে ঢেকে রাখে তাদের, নাকি যারা উদোম চলে তাদের?

তবে হ্যাঁ, যাদের বিবেক লোপ পেয়েছে, যাদের ওপর পাশবিকতা ভর করেছে, রুচিবোধ যাদের কাছ থেকে বিদেয় নিয়েছে, যাদের রঙিন চশমা তামাম পৃথিবীটাকেই নোংরা ও উলঙ্গ দেখে তাদের কাছে তো উদোম দেহটাই ভালো ঠাওর হবে! যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ নেই, যারা মানুষের কাতারে পড়ে না, তাদের ব্যাপার তো আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক!

ডক্টর বন্ধুর তিক্ত সংলাপ

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডক্টর ইয়াহইয়া আল শামা। আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে তিনি প্যারিস থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। উচ্চতর ডিগ্রি লাভশেষে ফিরে এসে আমাকে তিনি একটি তথ্য দিয়েছিলেন। তাহলো, একবার তিনি প্রবাসে থাকাবস্থায় ভাড়া রুমের খোঁজে এক বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঘরের বাইরে ছোট একটি বালিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তিনি ঘরের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর কী হয়েছে?'

জবাবে ঘরের লোকেরা বলল, ও আমাদেরই মেয়ে। কিন্তু বয়স হওয়ার কারণে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন সে একাকী জীবনযাপন করবে।

আমার ঐ বন্ধু তাদেরকে বললেন, তো কাঁদছে কেন?

জবাবে তারা জানাল যে, সে আমাদেরই একটি রুম ভাড়া চেয়েছিল। আমরা ওর কাছে ভাড়া দেইনি।

তিনি জানতে চাইলেন কী কারণে ভাড়া দিতে চাচ্ছেন না?

জবাবে তারা বলল, সে ভাড়া বাবদ বিশ ফ্রাস্ক দিতে চেয়েছে। অথচ অন্যরা ত্রিশ ফ্রাস্ক দিয়েও ভাড়া নিতে রাজি। তাকে বিশ ফ্রাস্কে ভাড়া দিলে যে আমাদের দশ ফ্রাস্ক আয় কমে যায়!

সুপ্রিয় পাঠকমহল! অনেকের মন সবসময় থাকে সন্দেহপ্রবণ। তাই এমন কারো মনে আমার বর্ণিত এই ঘটনার প্রতি সন্দেহ জাগতে পারে। আমি তাদের অনুরোধ করব যে, ডক্টর ইয়াহইয়া আল শামা এখনও বেঁচে আছেন। আপনারা দয়া করে তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং নিজের কানে সেই কান্না শুনেছেন।

সত্যি বলতে কি! যারা ইউরোপ-আমেরিকা সফর করেছেন, তারা আমাদের কাছে এ জাতীয় আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে নারীরা পেটের দায়ে নিজেদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করছে আর লাঞ্ছিত

হচ্ছে। অহরহ আমরা এসব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। সামান্য খাবারের জন্যে নিজেকে তারা বিলিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করে না। তার তুলনায় আমাদের নারীরাই অধিক সম্মানের সাথে আছেন।

আপনারা নিশ্চয় 'তাওফীক আল হাকীমে'র লেখাটি পড়ে থাকবেন। সেখানে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানো হয়েছে, একটি মেয়ে তার জীবনের দায়ে কী ধরনের কাজের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল? মেয়েটি নিরুপায় হয়ে এক পর্যায়ে এক সুসাহিত্যিকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটির দুর্বলতার সুযোগকে ষোলআনা কাজে লাগায় সেই লেখক। তিনি মেয়েটির সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করতেন। তারপরও মেয়েটি বাধ্য হয়েছিল মুখ বুজে সব মেনে নিতে। কারণ মেয়েটির মূল চাহিদা ছিল শুধু দু'বেলার আহার, একটু থাকার ব্যবস্থা। কিন্তু ঐ লেখকই মেয়েটিকে স্বীয় জৈবিক চাহিদায় ব্যবহার করে পরবর্তীতে তাকে ধূর ধূর করে বাড়ি থেকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

লাভ ম্যারেজ

আমি আরবের এক কবির কথা বলছি। তখন তার টগবগে তারুণ্য উজিয়ে পড়ছিল। টইটম্বুর তারুণ্যের হেফাজতের ভাবনা তার অনেক কবিতা ও সাহিত্য রসে ভরে ওঠে। কিন্তু বিয়ে বলে কথা! ভাবলেই কি আর বিয়ে করা যায়? বিয়ের জন্য দরকার অনেক কিছু। আবার উপযুক্ত পাত্রীই বা পাবে কোথায়? এদিকে যৌবনের তরও সইছে না। তার যৌবন নদীতে যে ভরা জোয়ার। তিনি কবিতার ছন্দে খুঁজে পান নিজের ব্যতিক্রমিতা। তার রচিত সাহিত্যে ঝরে পড়তে থাকে অজানা রস, অচিন জাদু।

এরই মধ্যে তার কবিমনের সামনে বাঁকা চাঁদের মতোই উঁকি দেয় এক ছিপছিপে গড়নের যুবতি। এক মার্কেটে তার চোখে ধরা পড়ে সেই দুধে আলতা গণ্ডালোক। রক্তিম চেহারা। টসটসে ভরা যৌবন। তার কোমর দোলা হাঁটার মাঝে কবিতার ছন্দ খুঁজে পান কবি। ব্যাস! আর যান কোথায়! তিনি যুবতির প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু আরব্য নারীরা যে ওপেন চলাফেরা করেন না। কী করে মনের ইচ্ছা পুরিয়ে দেখবেন তাকে? তিনি নানা ছুতো খুঁজতে থাকেন। মিছে কেনাকাটার অজুহাতে তরুণীর কাছে ঘেঁষার চেষ্টা চালান। কিছুটা সফলও হন।

আরব্য যুবক কবি মুহূর্তে দক্ষ কাস্টমার বনে যান। ঐ যুবতি যেই দোকানে প্রবেশ করে, কবি সাহেবও পৌছেন সেই দোকানে। কালো বোরকার আস্তিন

হতে বেরিয়ে আসা রমণীর হাতের তালু আর কব্জি নজর কাড়ে তার। ব্যাস! এতটুকুতেই তার মাথায় চক্কর লেগে যায়। উদ্বেগ আর প্রেম-ভালোবাসায় হৃদয় হয়ে পড়ে অস্থির ও ব্যাকুল। সে তার প্রেমে পড়ে যায়। শুরু হয় ভালোবাসা। কিন্তু সেটি একতরফা ভালোবাসা। তবু তাতেই তার জবান দিয়ে ঝংকৃত হতে থাকে উচ্ছ্বসিত গীতছন্দ। কাব্যের ফুল ঝরতে থাকে দিনকয়েক।

যুবতি তার অভিভাবকসহ কেনাকাটা শেষ করে গাড়িতে চেপে বসে। কিন্তু তরুণ কবির কি আর হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার সময় আছে? তার যে আর তর সইছে না। ব্যাস, তিনিও একদেখাতেই প্রেমে পড়ে যাওয়া যুবতির বাসার ঠিকানা সংগ্রহের মানসে গাড়ি ফলো করে পেছনে পেছনে নিজ গাড়ি চালাতে থাকেন। অবশেষে অন্তত এই ধাপে তিনি সফল হন। চুপিসারে দূরে দাঁড়িয়ে বাসার ঠিকানা কালেকশন করেন।

এবার কবির নাওয়া খাওয়া বাদ যাওয়ার উপক্রম। কেমন যেন উন্মাদ ভাব তার দেহ জুড়ে। কাজকর্মে তার মন বসে না। কারণ অপরূপাকে যে তার চাই-ই চাই। কিন্তু এত সহজেই কি সোনার হরিণ বাগে আসে! তিনি তাকে পাওয়ার নানা ফন্দি আঁটতে থাকেন। কী হারিয়ে ফেলেছেন– এমন ভাব তার আপাদমস্তকে। তিনি মনের মুকুরে এক মহাসিংহাসন রচনা করেন ঐ যুবতির জন্য। গড়ে তোলেন অপরূপ তাজমহল!

'প্রচেষ্টা সাফল্য আনে পুণ্য আনে ধন' প্রবাদ যুবক কবির ক্ষেত্রে বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। তিনি নিরাশার ছাই ঝেড়ে ফেলে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। যুবতি যুবক কবির ভালোবাসার কথা না জানলেও কবি স্বপ্নের প্রেয়সীর ভালোবাসার জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন।

একপাক্ষিক ভালোবাসার জানা অজানা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে গত হয় তার দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর। একেকটি মুহূর্ত তার কাছে মনে হয় যেন একেক যুগ। এভাবেই পরিষ্কার হতে থাকে তার বেদনার নীল আকাশ। তিনি স্বপ্নে বীজ বুনেন লাভ ম্যারেজ তথা ভালোবেসে ঘর বাঁধার। কিন্তু কিভাবে পাঠাবেন বিয়ের প্রস্তাব! সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তার আশার তরি তীরের দেখা পায়। তার নিরন্তর প্রচেষ্টা তাকে নিরাশ করেনি। সফলতা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ভালোবাসার আকাশ হতে সরে যেতে থাকে উড়ে বেড়ানো কালো মেঘগুলো। তার সামনে ভেসে ওঠে কুরআন মাজিদের চিরন্তন বাণী–

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ

فِىٓ أَنفُسِكُمْ ...... وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সে নারীকে বিবাহের পয়গাম দাও কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহ তায়ালার তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখ, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল। *[বাকারা : ২৩৫]*

কুরআন মাজিদের এ আয়াত যুবকের মনে শতগুণে সাহস বাড়িয়ে দেয়। এক পর্যায়ে তিনি সাহস করে প্রস্তাব পাঠান বিয়ের। কবি যুবতিকে তার মনের কথা খুলে বলেন।

কবি ছিলেন স্মার্ট চেহারার। শিক্ষাগত যোগ্যতাও সর্বোচ্চ ডিগ্রি। আর চলাফেরা, আদর্শ! মন্দ নয়। ফলে যুবতিরও মনে ধরে তাকে। তার ইচ্ছেনদীতে তরতরিয়ে জোয়ার আসে। তিনিও যেন এতদিন এমন একটি প্রস্তাবেরই অপেক্ষা করছিলেন। যুবতির ইচ্ছায় তার অভিভাবকগণ কবি পরিবারের খোঁজখবর নেন। অবশেষে সফল হয় 'লাভ ম্যারেজ'।

প্রিয় পাঠক! একবার ভেবে দেখেছেন কি যুবতিকে একবার দেখেই সাহিত্যজগতের কবি কেন তার প্রেমে মাতাল হয়ে গেলেন? এর কারণ হলো, আরবের রমণীরা মানুষের অগোচরে থাকে। মুক্তা যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে নজরের আড়ালে থেকে দামি হয়, ঠিক তেমনি। বিপরীতে পাশ্চাত্যের নারীদের সমুদ্রতীরে, বাজারে-বন্দরে সবখানে দেখা যায়। ফলে তাদের পায়ের গোছা দেখেও মানুষ উত্তেজিত হয় না, হৃদয় দুলে ওঠে না। এতে তারা লজ্জাবোধও করে না। রমণীর পায়ের গোছা, চেয়ারের পায়া এবং ঘরের কাঠ সবই তাদের কাছে সমান হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের সমাজে বৈবাহিক ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে।

বৈবাহিক সম্পর্ক হলো স্থায়ী বন্ধন। এর মাধ্যমে একজন পুরুষ স্বাধীন-রুচিবোধের সাথে যুক্ত হয় এবং মানসিক চাহিদা পূরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এ চাহিদা যদি ভিন্নপথে অর্জিত হয়, তাহলে আর বিবাহের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থাকল কোথায়?

সৌন্দর্য প্রদর্শন করা ও পর্দাহীনতা ইহুদিদের মজ্জাগত অভ্যাস। নারীর ফেতনা দ্বারা কোনো জাতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও কৌশল সফলতার দাবিদার। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অতীতে উলঙ্গ

নারীরাই ছিল তাদের বিভিন্ন সংস্থা ও কার্যক্রমের বড় হাতিয়ার। ইহুদিরা এ বিষয়ে প্রাচীন ও অভিজ্ঞ। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন–

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং ভয় কর নারীকে। কারণ, বনি ইসরাইলের প্রথম ফেতনা ছিল নারীর ফেতনা। *[মুসলিম শরীফ]*

সিফরে আশিয়া কিতাবের তৃতীয় সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছিহয়ুন গোত্রের মেয়েদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের কারণে শাস্তি প্রদান করেন।

পরিতাপের বিষয় হলো, পশ্চিমা নারীরা নিজেরাই নিজেদের সম্মান হারিয়ে ফেলেছে। এখন তাদের ভরণপোষণ পর্যন্ত দেয়ার মতো কেউ নেই। এ কারণে তারা বাধ্য হয়ে জীবনধারণের জন্যে কোনো না কোনো পেশা বেছে নিচ্ছে। কলকারখানার শ্রমিক হওয়া, হাটেবাজারে শ্রম দেয়া এবং রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেয়াসহ সব ধরনের কাজে অবাধে অংশগ্রহণ করছে। ইউরোপের নারীরা টয়লেট পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

ইউরোপে এমন অনেক তরুণী-যুবতি নারী আছে, যারা জুতা সেলাই করে, জুতা কালি করার বাক্স কাঁধে রাখে। এমনও কাউকে দেখা যায় যে, সে বই হাতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে; ঠিক এরই মধ্যে কোনো সাহেব পা বাড়িয়ে দিলেন জুতা কালি করার জন্যে। ব্যাস! পাশ্চাত্য-কন্যা মাথা নিচু করে জুতা কালিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইউরোপের এই হলো সামাজিক ব্যবস্থা। অথচ ঠিক একই মুহূর্তে প্রাচ্যের নারীরা নিজ নিজ ঘরে স্বামীর পাশে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করছে। আর তা দেখেই হিংসায় কলজে ফেটে মরে হায়েনা আর নির্লজ্জ পশুর মতো কিছু মানুষ নামের অমানুষ!

ইসলামের চিরন্তন বিধানের মধ্যেই রয়েছে নারীর মর্যাদা। এ বিধান মেনে নিলেই তাদের মধ্যে স্মার্টনেস খুঁজে পাওয়া যায়। এ বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের আসল মূল্য। যে নারী নিজের সৌন্দর্য লুকিয়ে রেখে চলে সে দামি সোনার মতোই অন্যের চোখে ধরা দেয়। আদর্শ যুবতির পেছনেই শিক্ষিত ও যোগ্য কবির ন্যায় হাজারো যোগ্য পুরুষ ঘুরঘুর করে থাকে। অনাদর্শ তরুণীকে টিস্যু পেপারের মতো ব্যবহারের পর ছুঁড়ে ফেলে

দিলেও প্রকৃত আদর্শ নারীকে নিয়েই ঘর বাঁধতে চায় পুরুষরা। এসব যুবক একজন আদর্শ জীবনসঙ্গিনী খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরকে মর্যাদার আসনে রেখে তাদের সাথে 'লাভ ম্যারেজ'এ আবদ্ধ হওয়াকে নিজের জীবনের বড় পাওনা মনে করে থাকে।

নন্দিত নারীর নিন্দিত গন্তব্য

আমাদের দেশের মেয়েদের বিয়ের বয়স হলে বিভিন্ন স্থান থেকে পাত্রের সন্ধান আসতে থাকে। বড় বড় হাদিয়া-তোহফা, দেনমোহর নির্ধারণ হয়ে থাকে। ইসলামি শরিয়তের নির্দেশনা হলো, এই হাদিয়া ও দেনমোহর কেবল নারীর অধিকার। ভাই-বাবা কারও এতে দখল নেই। তার অনুমতি ছাড়া কেউ এখানে হাতও লাগাতে পারবে না।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের নারীরা পুরুষের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। একজন পুরুষের নাগাল পেতে পঞ্চাশটি গর্ভপাত করতে হয়। কখনও এই অকাল গর্ভপাত তাদের মৃত্যুর কারণও হয়ে থাকে। এরপরও যদি তাকে বিয়ে করতে সম্মত না হয়, তাহলে বড় অঙ্ক নিয়ে পুরুষের ধরনা দিতে থাকে। তাদের সমাজে পুরুষকে নারীরাই দেনমোহর(?) প্রদান করে। প্রদত্ত অর্থে স্ত্রী কোনো অধিকার পায় না। স্বামীর একক কর্তৃত্বই সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাতে নারীর টু-শব্দটি করার সুযোগ থাকে না।

হয়তো আপনি বলবেন যে, আরে! এ তো সময় ও যুগের পরিবর্তনের কারণেই হয়েছে। আমাদের এখানেও তো বৈবাহিক ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে! চিরকুমারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে!

হ্যাঁ, আমি আপনার এ কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করি না। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো, কী কারণে এমনটি হতে চলেছে?

শুনুন তাহলে। আমাদের নন্দিত নারীরা আজ নিন্দিত গন্তব্যের পথচারিণী। আজকের যুবকেরা যেই নন্দিত ললনাকে নিয়ে সুখের স্বর্গ গড়ার স্বপ্ন দেখে, ক'দিন পরে সেই তার চোখেই তাকে আবিষ্কার করে নিন্দিত গন্তব্যে। ফলে নন্দিত সোনালি স্বর্গ তাসের ঘরের মতোই খানখান করে ভেঙ্গে পড়ে।

আমাদের দেশে বৈবাহিক ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ার মৌলিক কারণ হলো, আমরা ফিরিঙ্গি জাতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছি। তারা আমাদের কাছে নারীসংক্রান্ত যে সমস্ত অভিযোগ তুলেছিল, সেগুলো নির্দ্বিধায় আমরা মেনে নিয়েছিলাম। সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের হৃদয়ে গত কয়েক যুগে তাদের

চিন্তাধারা বপন করে দিতে সমর্থ হয়েছে। অথচ সে সময়ে আমরা অচেতন ও ঘুমন্ত এক জাতি। তাদের জীবনধারার বাহ্যিক চাকচিক্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাদেরকে আমরা উন্নত ও প্রগতিশীল হিসেবে বিবেচনা করতাম। তারা যে সিদ্ধান্ত ও মতামত ব্যক্ত করত, সেগুলোকেই নির্ভুল ভেবে অন্ধ অনুকরণে উঠেপড়ে লেগে যেতাম।

কিন্তু বাস্তবে এসব অনুকরণ আরবের শোণিতধারা কিভাবে বরদাশত করতে পারে? মনে রাখবেন ইসলামের মশালধারী আরব জাতি হচ্ছে সবচেয়ে আত্মমর্যাদাশীল জাতি। তারা লজ্জায় কন্যাসন্তানকে জীবন্ত পুতে রাখত। কোনো আরব কি সহ্য করবে, তার আনন্দ-অনুষ্ঠানে অপরিচিত কেউ মুখ বাড়িয়ে বলবে যে, 'প্লিজ আসতে পারি?'

কিভাবে তাকে মেনে নিতে পারবে? আর কেনইবা মেনে নিবে? একজন আরব তো তার ঘড়ি বা একটি ম্যাচের কাঠির ক্ষেত্রেও এসব সহ্য করবে না। হ্যাঁ, এই পাশ্চাত্যের লোকটি অনুমতি দিতে পারে। শুধু অনুমতিই না; বরং নিজের স্ত্রীকেও দিয়ে দিয়ে প্র্যাসটিজ রক্ষার খেলায় মেতে যাবে। তাকে নিয়ে নৃত্য করবে। দেহে দেহ মিলাবে। মুখে মুখ লাগাবে। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। আরো কতো কী!

পক্ষান্তরে পৃথিবীর কোনো আরব নেই, যে এতে সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে। কোনো মুসলিমও এটা মেনে নিতে পারে না। এমনকি যার ভেতরে পৌরুষ আছে, সেও এসব বরদাশত করবে না। শুধু মানুষই নয়, একমাত্র শূকর ছাড়া ভিন্ন কোনো প্রাণীও সহ্য করবে না।

আপনাদের নিশ্চয় মনে থাকার কথা– আমেরিকান মহিলাটি শায়খ বাহযাতুল বায়তারকে কী বলেছিল? ফ্রান্সের বা আমেরিকার যেকোনো নারীর সাথে কথা বলার সুযোগ হলে তাদের প্রত্যেকে একই জবাব দিত যে, তোমরা আমাদের শরিয়তের প্রতিশোধ নিচ্ছ। ইসলামি শরিয়ত নারীকে মিরাসের সম্পত্তিতে পুরুষের অর্ধেক স্থির করেছে এবং একজন পুরুষকে একসাথে একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে।

পক্ষান্তরে আমেরিকান নারীদের আপনারা জিজ্ঞেস করে দেখুন তো, তারা পুরুষের অর্ধেক মিরাস গ্রহণ করতে চায় কিনা এবং একজন পুরুষের দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে থাকতে প্রস্তুত কিনা?

জার্মান রমণীদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, যুদ্ধের পরে তারা দশজন একজন স্বামীর অধীনে থাকতে প্রস্তুত আছে কি না, যে তাদের সবার মাঝে সমান

হারে সবকিছু বণ্টন করবে? এই পদ্ধতি ছাড়া আর কী উপায়ে জার্মান নারীর আধিক্য সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে?

প্রকৃতির মাঝে মিলনের সুর

একটা প্রকৃতির ওপর আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রকৃতিই দুটি জাতিকে পরস্পর মিলনের তাগিদ দেয়। এ দুয়ের মাঝে মিলন অপিরহার্য। ধরুন, কোথাও পঞ্চাশজন পুরুষ আছে। বিপরীতে একশত নারীর অবস্থান হলে সেখানে তরুণীর কী হতে পারে? একজন পুরুষের কি দু'জন-দু'জন করে নারীর দায়িত্ব নেয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় থাকতে পারে? একই প্রকৃতি কি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান নেই? মৌমাছি ও মোরগ-মুরগীর মাঝে নারী-পুরুষের ব্যবধান কি বড় বেশি?

পাশ্চাত্যের একজন পুরুষ কি বিয়ের আগে চারজন নারী গ্রহণ করে না? হ্যাঁ, করে। তবে তারা করে অবৈধ পন্থায়। সুতরাং আপন বিবেককে প্রশ্ন করুন যে, আপনারা কি ইবলিসের শেখানো পথে সন্তুষ্ট হবেন? নাকি আল্লাহ্প্রদত্ত বৈধ পথ অবলম্বন করে?

আপনি মনে করবেন না যে, পাশ্চাত্যের নারীরা সম্মানজনক ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন করছে। নাহ! আল্লাহর কসম! কখনও নয়। আমি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছি। আমি আমার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে হলফ করে বলতে পারি যে, মুসলিম নারীদের চেয়ে জগতে সম্ভ্রান্ত ও অধিক সম্মানিতা কোনো নারী নেই।

আমাদের মুসলিম সমাজে স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর জন্যে। তার বন্ধুর জন্য নয়। ঠিক তেমনই নারী হচ্ছে তার স্বামীর জন্যে। তার বান্ধবী বা জিএফএর জন্য নয়। স্বামী-ই তার একান্তজন। তার সামনেই পর্দা উন্মোচিত হবে; অন্য কারও সামনে নয়।

এবার বলুন তো, এটা কি একজন রমণীর জন্যে দোষের বিষয়? এ সমস্ত পরজীবীরাও কি নিজেদের স্ত্রীদের অন্যের সাথে থাকতে দিবে? নির্দিষ্টভাবে একটি প্লেট তার জন্যে রেখে দিবে আর সেখান থেকে একাই ভক্ষণ করবে– এতে কি একজন বিবেকবান পুরুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না? নাকি অনেকের হাত দিয়ে ঝুটা করা উচ্ছিষ্ট ভোজে সে সন্তুষ্ট হবে?

আমি জিজ্ঞেস করি যে, পবিত্রতাই কি দোষের বিষয়? পাপ থেকে দূরে থাকাটাই কি অন্যায় বা লজ্জার কারণ? তাদের কাছে ভালোই কি মন্দের নামান্তর? আলোই কি তাদের কাছে অন্ধকার?

সুপ্রিয় পাঠক! অন্যের মাথা দিয়ে চিন্তা-গবেষণা, শত্রুদের চোখ দিয়ে দর্শন-পর্যবেক্ষণ এবং বানরের মতো তাদের অনুসরণ আমরা অনেক করেছি। এবার ফেরা দরকার নিজেদের রুচিবোধে, নিজেদের কৃষ্টিকালচারে এবং ইসলামি দর্শনে।

মনে রাখবেন, পশ্চিমা নারীরা পুরুষের খেলার পুতুল। তাই তাদের মতো কেন হতে দেব আমাদের রমণীদের? আমাদের রমণীরা আমাদের মর্জি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবনযাপন করবে। যেন আমরা তাদের জন্যেই হতে পারি। যেন আমরা তাদের নিয়েই তুষ্ট জীবন ধারণ করতে পারি। অন্য কারও দিকে আমাদের নজর ফেরানোর প্রয়োজন নেই।

অভিজ্ঞতার আলোকে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, জগতে মুসলিম রমণীদের চেয়ে উত্তম কোনো রমণীই হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজস্ব পোশাক ও কৃষ্টিকালচার এবং ইসলামি জীবনবিধান ও চারিত্রিক পরিশীলতা গ্রহণ করবে।

মনে রাখবেন– এই সমাজ থেকেই জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন হযরত আয়েশা, আসমা, খাওলা, ফাতেমা, রবীয়া। এখান থেকেই খ্যাতিলাভ করেছেন শত শত তাপসী নারী, আলেমা, আবেদা। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন সেই সন্তানেরা মায়েরা, যারা যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন ঘোড়সওয়ার আর রাতের আঁধারে ছিলেন ইবাদতগুজার। যারা সিংহাসনের বুকে ছিলেন অহিংস সিপাহসালার আর চিন্তা-গবেষণায় ছিলেন প্রতিভার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণকারী। অর্থ ও বিত্তের দিক থেকে তারাই ছিলেন প্রতাপশালী সম্রাট। তাবৎ দুনিয়া যাদের কাছে মাথা নত করত ইসলামের বিমুগ্ধ শোভায়।

বিয়ের বয়স কত

বিয়ের প্রকৃত বয়স কত– এ নিয়ে মহাবিপাকে দুনিয়ার মানুষ। অনেক অভিভাবক কুয়ারার সুরে বলে থাকে যে, 'এখনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ের বয়স হয়নি। আর কয়েক বছর অপেক্ষা করি! তারপরই না হয় তাদের বিয়েটা দিই। ছেলেমেয়ের পড়ালেখাটাও একটা পর্যায়ে পৌঁছুক কিংবা কোনো চাকরি বাকরি ধরে ফেলুক। না হয় বিয়ে করে তারা খাবে কী? বউকে দিবে কী? তাছাড়া পড়ালেখা শেষ না করে বিয়ে করলে লোকসমাজে মুখ দেখাই কিভাবে?' ইত্যাকার প্রশ্ন আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে।

জাতিসংঘ ছেলে-মেয়ে উভয়ের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়সসীমা নির্ধারণ করেছে আঠারো। এর আগে সবাই শিশু। তাই আঠারো বছরের আগে কোনো ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ে দেয়া কথিত আন্তর্জাতিক আইনে সিদ্ধ নয়। কিন্তু বাস্তবে জাতিসংঘের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার এই বয়স নির্ধারণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত? প্রকৃতপক্ষে বিয়ের প্রকৃত বয়স কত?

এ প্রশ্নের জবাবে আমার দ্বিধাহীন বক্তব্য হলো, আপনি নিজ থেকে প্রথম যেদিন নিজের সাবালকত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি লাভ করবেন, সেটাই আপনার বিয়ের উপযুক্ত বয়স।

সব বিষয় দলিল-প্রমাণ দিয়ে হয় না। বিয়ের বয়স নির্ধারণের জন্যেও কোনো দলিল-প্রমাণ তলবের প্রয়োজন নেই। কারণ কারও মতে বিয়ের বয়স হচ্ছে ত্রিশ। কেউ আবার মত দিয়েছেন চল্লিশ।

আমার জবাব হলো– আল্লাহ মানুষকে যে ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেছেন, তার অনুকূল হলেই বিয়ে করে ফেলা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। আমার দেয়া জবাবটি বোঝার জন্যে একটা ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মনে রাখবেন যে, আল্লাহ মানুষকে দুটি স্বভাবজাত গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি হলো মানবসত্তার সংরক্ষণ ভাবনা। এই ভাবনার কারণেই আমাদের ক্ষুধা লাগে। দ্বিতীয়টি হলো জাতিসত্তার সংরক্ষণ চেতনা। এই চেতনার তাগিদেই বংশধারা টিকে আছে। এই দুটির একটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে অপরটিও নির্ভুল মেনে নিতে হবে।

আচ্ছা বলুন তো, মানুষ কখন খাবার গ্রহণ করে? আপনি অবশ্যই এ প্রশ্নের জবাবে বলবেন যে, যখন খাওয়ার চাহিদা হয় কিংবা ক্ষুধা লাগে তখনই মানুষ খাবারের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। আপনার এই জবাবের সূত্র ধরেই আমি বলব যে, মনের মাঝে জৈবিক চাহিদা পূরণের চাহিদা জন্ম নিলে কিংবা যৌনচাহিদা পূরণের তাগাদা অনুভব করলেই বিয়ের প্রকৃত বয়স হয়ে থাকে। কথাটাকে খোলাসা করার জন্য আবার বলছি–

মানুষ কখন খাবার খায়?

জবাবে আপনারা বলবেন, যখন ক্ষুধা লাগে তখন।

তো আমিও বলব, বিয়ে তখনই করবেন, যখন কামনার উদ্রেক হয়, মনের সুপ্ত বাসনা জাগ্রত হয়। অর্থাৎ যে সময়ে পৌরুষ আসে, যৌবন আসে তখন। মোটামুটি সর্বোচ্চ আঠারো বছর ধরা যায়।

আপনারা প্রশ্ন করবেন, এ বয়সে পৌছার পরও যদি বিয়ে করার মতো অর্থ হাতে না থাকে, তাহলে কী করব?

আমি বলব, ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পয়সা না থাকলে সে যা করে, এই যুবকও তা-ই করবে। খাবার হাতে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে।

আপনারা বলবেন, যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে না পেরে সামনে অন্যের খাবার উপস্থিত পেয়ে চুরি করে খেয়ে ফেলে এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরা কী করব?

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, প্রতিটি সমাজে অনাহারীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, যেন তারা চুরি বা কোনো অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে। যদি কোনো কারণে সমাজের লোক খাবারের যোগান দিতে না পারে এবং তাদের থেকে চুরির আশঙ্কা করে, তাহলে সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো, যার যার মাল ও অর্থসম্পদ হেফাজত করা। এখন যদি বলেন যে, তাদের চুরি করা একদিকে বৈধ! কারণ, সমাজ তাদেরকে খাদ্যবঞ্চিত করেছে; অথচ এটা তাদের জৈবিক অধিকার? অপরদিকে অবৈধ! কারণ অন্যের সংরক্ষিত জিনিসে তারা হাত লাগিয়েছে। ঠিক একই কথা বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিয়ের বয়স নিয়ে বিটলামি

মূলত বিবাহের স্বাভাবিক বয়স হলো যে বয়সে ছেলেমেয়ে বালেগ-বালেগা হয়। কিন্তু এ বয়সে তারা স্কুল-কলেজে বা মাদরাসায় পড়াশোনা করে। তাদের হাতে তেমন অর্থকড়িও থাকে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কমপক্ষে পঁচিশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। অর্থাৎ যে সময়ে পারস্পরিক মিলনের সূত্রপাত হওয়ার কথা, ঠিক সে মুহূর্তে তাদের সামনে স্বভাববিরুদ্ধ বিশাল বাধা আপতিত হয়।

তাহলে আমরা এর মোকাবেলা কিভাবে করতে পারি? কী করার আছে এই যুবকের? সে তো এই দশটা বছর বিয়ে ছাড়া কাটিয়ে দিতে বাধ্য। অথচ যৌনচাহিদা জীবনের এই দশ বছরই সর্বাধিক হয়ে থাকে!

আল্লাহ তায়ালা তার দেহের মাঝে জ্বলন্ত অগ্নি স্থাপন করে দিয়েছেন। যদি এই আগুন বিয়ের মাধ্যমে না নেভানো হয়, তাহলে এর তাপে হয়তো নিজে দগ্ধ হবে নতুবা ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্যের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। এখানেই হলো মূল সমস্যা। এ নিয়েই আলোচনা করা দরকার।

আমি মনে করি, বিয়ের প্রকৃত বয়স নিয়ে আমাদের অভিভাবকরা বিটলামি করে থাকেন। কারণ যিনি এ বিষয়ে কলম ধরবেন, তার জন্যে সবচেয়ে সহজ হলো চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বসা। এরপর রায় ঘোষণা করা। কিন্তু আপনারা হয়তো পড়ালেখা, কর্মযজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, চাকরি করা ইত্যাদি মিলিয়ে বলবেন যে, বিয়ের উপযুক্ত বয়স হল ত্রিশ বছর!

আমি বলব, এটা আপনার কেবলই ব্যক্তিগত অভিমত। এ দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু ফ্রি কথা বললেই তো আর হলো না। যে বিচারক ফাঁসির রায় ঘোষণা করেন, এখানে তার কষ্ট-ক্লেশের কী আছে? কেবল ঠোঁটদুটো নাড়িয়ে একটা মত প্রকাশ করে দেন। কিন্তু মুসিবত হয় তার, যার বিরুদ্ধে রায় হয় এবং কার্যকর হয়। আর এখানে রায় প্রকাশ করা হচ্ছে যুবক-যুবতির বিরুদ্ধে। তাই আপনার ত্রিশ বছর বলতে কষ্ট না হলেও এত বছরে তাদের অবস্থা মহাবিপর্যয় পয়দা করে ছাড়বে।

মনে রাখবেন, প্রকৃতিগতভাবে বয়স পনেরো হলেই তবিয়ত ও সুপ্ত চাহিদা যুবক-যুবতির ভেতরে যৌনক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আমাদের চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃ মহোদয় তাদের জন্যে মত প্রকাশ করে বলেন, ত্রিশের আগে বিয়ে করা যাবে না। আমার জিজ্ঞাসা হলো, তাহলে বাকি পনেরো বছর সে কী করবে? কুড়িতে যে বুড়ি হয়– সেই প্রাচীন প্রবাদ তো আর অভিজ্ঞজনরা এমনিতেই বলে যাননি!

যে সমাজ যুবককে বিয়ে করতে নিষেধ করে, তারা এই আগুন নিভানোর বিকল্প কোনো পথ বের করতে পারেনি। যখনই বেচারা এই যৌনক্ষুধা কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে পারে, তখনই আমরা তাকে সেই তাড়না স্মরণ করিয়ে দিই নগ্ন ফিল্ম উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ চিত্রাবলি, পথেঘাটে তরুণীদের অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার মাধ্যমে। মনে রাখবেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ অনুকরণ ব্যতীত মানুষ অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে তেমন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟

قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

যারা আমাকে অস্বীকার করে তারা ব্যতীত আমার সব উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীরা এ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কারা অস্বীকার করে? জবাবে রাসূল সা. বললেন, যে আমার অনুকরণ করলাসে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে আমার নাফরমানি করল, সেই আমাকে অস্বীকার করল। *[বুখারি শরীফ]*

মনে রাখবেন! একজন নারী পথে হাঁটলেও নারী; বাজারে গেলেও নারী; কলেজে এলেও সে নারী। সবখানেই রয়েছে তার সুপ্ত চাহিদা জাগরিত করার ইন্ধন। কিন্তু আমরা এই আগুন বুকের ভেতর পনেরো বছর জ্বালিয়ে রাখার রায় ঘোষণা দিচ্ছি। সাথে সাথে তাকে বলছি, ক্যাম্পাসে যাও, দরসে যাও, অধ্যয়নে ব্যস্ত হও। তাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা তোমার কর্তব্য।

পৃথিবীর সস্তা জিনিস হলো কাউকে উপদেশ প্রদান করা। আমরা যুবককে অন্যায় অপরাধ থেকে ফিরে থাকার আসল পথ অনুসরণ না করে তার মাথায় উপদেশের কাঁঠাল ভাঙতেই বেশি সাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকি। এক্ষেত্রে আমি আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি, যে ব্যক্তিকে পনেরো বছর জেলে বন্দি রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা এ যুবকের চেয়ে করুণতর নয়।

তাহলে এখন উপায় কী?

একটিই পথ। তাহলো স্বভাবধর্মের দিকে ফিরে আসা এবং ফিতরাতের অনুসরণ করা। কারণ, একজন মানুষ জাতিগত স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না। একজন যুবক বিয়ে করবে আঠারো বছর বয়সে। যুবতির বয়স হবে ষোলো কিংবা সতেরো বছর। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি এবং উন্নত চরিত্র ও আদর্শ নীতি চালু করা যাবে না। যুবক-যুবতিদেরকে নীতি-নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সমাজ ও পরিবেশকে অশ্লীলতা, পাপাচার ও যৌনচাহিদা উদ্রেককর অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে। মেয়েদের ব্যাপারে বাবাদের দায়িত্ববান এবং তাদের সম্পদ ও সম্ভ্রম বিনষ্টের কারণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

এটিই জবাব।

আমি আশাবাদী, যিনি এই লেখাটি পাঠ করবেন তিনি অবশ্যই বলবেন যে, এটি সঠিক। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, কেউ আমলে নেন না। কেউ এ

বাস্তব সত্যকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন না; বরং সবাই উল্টো রথে চলতে যেন পছন্দ করেন।

দেরিতে বিবাহের ভয়াবহতা

ইসলাম যুবক যুবতি প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই তাদেরকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে সমাজদেহে ব্যভিচারের বিষবাষ্প ছড়ানোর সুযোগ পায় না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার দোহাই দিয়ে আজ যুবক যুবতিদের দেরিতে বিবাহ দেয়া হয়। ফলে বিয়ের আগেই তারা নানাভাবে বিয়ের স্বাদ উপভোগ করতে উৎসুক হয়ে পড়ে।

তথাকথিত পুঁজিবাদী সমাজের বেঁধে দেয়া বিয়ের বয়সের কারণে 'Late Marriage' তথা দেরিতে বিবাহের প্রচলন দিন দিন বেড়েই চলেছে। গবেষকগণ এর প্রধান কারণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাহলো, পুঁজিবাদী সমাজ অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার সময় তারা মূলত সেই 'Economical' তথা অর্থনৈতিক দিকের কথা চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত দেয়। "Biological Physical" দিক তারা বেশি গুরুত্ব দেয় না।

ছেলে মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদীরা "Economical" দিক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ এখানে তাদের বেশি গুরুত্ব দেয়ার কথা ছিল "Biological", "Spiritual" ও "Moral" দিককে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। মানুষ দেরিতে বিয়ে করে মানসিক ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে। নানা কারণে ডিভোর্স এর ঘটনা মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"Late Marriage" তথা দেরিতে বিবাহের কারণে নারী-পুরুষ উভয়ই তাদের বিবাহিত জীবনে নানা ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হয়। নিচে নারী ও পুরুষের লেট ম্যারেজের ভয়াবহতা তুলে ধরা হলো।

পুরুষের 'লেট ম্যারিজ' এর সমস্যা

বর্তমানে পুরুষরা নারীদের থেকে অনেক বেশি "Late Marriage" তথা দেরিতে বিবাহ করছে। এর প্রধান কারণ হলো 'ক্যারিয়ার বিল্ডাপ' করা। বেশিরভাগ পুরুষই এখন ৩০-৪০ বছর বয়সের মধ্য বিয়ে করে। ফলে অনেককেই বিবাহিত জীবনে নানা ধরনের ঝামেলার মুখে পড়তে হচ্ছে। নিচে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পুরুষের দেরিতে বিবাহের কয়েকটি ভয়াবহ সমস্যা তুলে ধরা হলো–

১. Fertility কমে যায় : পুরুষদের মাঝে একটা ভুল ধারণা আছে যে, বয়স বাড়ার সাথে তাদের Fertility তথা সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আসলে এই ধারণা সঠিক নয়; বরং বেশ কিছু রিসার্চে প্রমাণিত যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষের Fertility কমতে থাকে। যদিও নারীদের তুলনায় ধীরে কমে।

২. সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হ্রাস পায় : বয়স্ক পুরুষ তার স্ত্রীর "Miscarriage (loss of an embryo or fetus before the 20th week of pregnancy)" এ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদী সমাজে নারীদের বয়স বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হ্রাস পাবার বিষয়টাকে যতটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয় না। এই সম্পর্কে Dr. Harry Fisch বলেন, "Not only are men not aware of the impact their age has on infertility, they deny it. They walk around like they're 18 years old,"

২০০২ থেকে ২০০৬-এর মাঝে "Miscarriage"-এর সম্ভাবনা নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যাদের বয়স ৩০-৩৪ বয়স তাদের "Miscarriage" হবার সম্ভাবনা ১৬.৭%, আর যাদের বয়স ৩৫-৩৯ তাদের ১৯.৫% এবং যাদের বয়স ৪০-এর উপর তাদের ৩৩%।

৩. সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে : দেরিতে বিয়ের কারণে সন্তান জন্ম দেয়াটাও স্বাভাবিকভাবে দেরিতে হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষ যদি দেরি করে সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সেই সন্তানের মাঝে জেনেটিক্যাল এবনরমালিটি তথা সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এই সম্ভাবনা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেই পুরুষের বয়স ৪৫-৪৯ তাদের সন্তানের Schizophrenia রোগ হওয়ার দ্বিগুণ ঝুঁকি আছে। তাদের তুলনায় যাদের বয়স ২৫ বা তার কম।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্রত্যেক পুরুষের যৌন সক্ষমতার চারটি Phase কাজ করে। এগুলোকে Sexual Response Cycle Gi 4Uv Phase বলা হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলো দুর্বল এবং সংক্রমিত হতে থাকে। সেই চারটি Phase হলো–

i) The Excitement Phase
ii) The Plateau Phase
iii) The Orgasm/Climax Phase
iv) The Resolution Phase

Aging দ্বারা এই চারটা ফেজই ইফেক্টেড হয়। নিচে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো–

The Excitement Phase : বয়স বাড়ার সাথে সাথে Erection হতে সময় বেশি লাগে। কারণ টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কমতে থাকে। বিশ বছরের পর থেকে এই হরমোনের Gradual Decline হতে থাকে।

The Plateau Phase : পুরুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌনাঙ্গের Muscle Tension (Myotonia) কমতে থাকে। ফলে Erection "Softer" হতে থাকে।

The Orgasm Phase : পুরুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে Orgasm এর Intensity কমে যেতে পারে। Ejaculation Pressure এবং Volume of SemenI কমতে পারে।

The Resolution Phase : ২০-২৫ বছরের একজন পুরুষ সঙ্গমের পর মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই পুনরায় সঙ্গম করার জন্য প্রস্তুত হয়। এক সঙ্গমের পর আরেক সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিরতিকে 'Refractory Period' বলে। আর এই 'Refractory Period' এর সময় বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে হ্রাস পায়।

Dr. Everold Hosein এ বিষয়ে বলেন–

'In one's late 20s, the (refractory) period maybe 15-30 minutes between orgasms. In one's 40s, the period iseven longer and may be as long three to four hours.

Refractory Period বয়সের সাথে কমতে থাকার মানে হলো সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সও কমতে থাকা।

৪. স্পার্ম কোয়ালিটি দুর্বল হয় : পুরুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার স্পার্ম কোয়ালিটি তথা ধাতু দুর্বল হতে থাকে। এতে খুব দ্রুত বীর্যপাত ঘটে।

জার্মানির বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে একজন পুরুষের স্পার্মের পরিমাণ কমতে থাকে। অর্থাৎ স্পার্মাটোজেনেসিস কমতে থাকে। স্পার্মের motility (ability to move toward its destination, an awaiting egg) এবং স্পার্ম গঠনিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। Embryologist Yves Menezo এই বিষয়ে মত দেন যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্পার্মে Genetic Defects দেখা দেয়।

নারীর 'লেট ম্যারিজ' এর সমস্যা

লেট ম্যারিজ তথা দেরিতে বিবাহের কারণে নারীরা সাধারণত যে ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হয় তাহলো–

১. যৌন চাহিদা হ্রাস পায় : নারীরা দেরিতে বিয়ে করার ফলে যে সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভোগেন তাহলো, Miscarriage (loss of an embryo or fetus before the 20th week of pregnancy). একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাদের বয়স ২০-২৫ তাদের Miscarriage এর ঝুঁকি হলো ১০ পার্সেন্ট, যাদের বয়স ২৬-৩০ তাদের ২০ পার্সেন্ট।

২. সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা কমে যায় : নারীদের 'Fertility rate' (সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা) বয়স বাড়ার সাথে সাথে হ্রাস পায়। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারীদের 'Infertility rate' বাড়তে থাকে। তার মানে ২০-২৫ বয়সের নারী যতটুকু Fertile, ২৬-৩০ বয়সের নারীরা তত Fertile হবে না। বেশিরভাগ নারীর 'Fertility rate' সর্বোচ্চ হয় ২৪ বছর বয়সে। আর এজন্য নারীদের 'Fertility rate' যখন উপরে উঠতে থাকে মানে তখন তাদের বিয়ে করার সবচেয়ে ভালো সময় হয়। অর্থাৎ যখন তাদের বয়স ১৭-২৪ হয়। তাছাড়া নারীদের এই সময় কনসিভ করাও সহজ। কারণ এই সময়ে তাদের ব্লাড প্রেসারের ঝামেলা, ডায়াবেটিস এবং Gynecological সমস্যা যেমন Fibroids, endometrisis এর আশঙ্কা কম থাকে।

৩. স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে : কোনো নারী যদি দ্রুত সন্তান নিতে পারে তাহলে তার ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক কমে যায়। কারণ প্রেগনেন্সি হরমোনগুলো Cancer-preventive Drugs এর মতো কাজ করে। Florence Williams তার বই Breasts এ উল্লেখ করেছেন-

'A woman who has her first child before age twenty has about half the lifetime risk of breast cancer as a nonmother or a mother who waits until her thirties to have children.'

৪. ডিম্বানুর কোয়ালিটি খারাপ হয় : বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারীদের ডিম্বানুর Quality খারাপ হতে থাকে। এ সম্পর্কে Connie Matthiessen বলেন, "As you get older, your ovaries age along with the rest of your body, and your eggs become less viable. For that reason, younger women's eggs are less likely than older women's to have

genetic abnormalities that result in Down syndrome and other birth defects."

অথচ বর্তমানে অনেক নারীকে দেখা যায়, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রভাবিত হয়ে ২৬-২৭ বছরে বিয়ে করে এবং কনসিভ করতে করতে বয়স গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিশের কোটায়। এ কারণেই মানবসমাজের একটা বিরাট অংশ আজকে জেনেটিক্যালি দুর্বল হচ্ছে। তারা ফিজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল দিক থেকে দুর্বল হচ্ছে।

নারীদের মনে রাখা উচিত যে, সুস্থ ও সবল মানবশিশু জন্মদানে তাদের ভূমিকাই বেশি। বর্তমানে দেরি করে সন্তান নেয়ার প্রবণতার ফলে যেসব অসুবিধা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে তা এক কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন The New Republic এর science editor Judith Shulevitz। তিনি বলেন- "For we are bringing fewer children into the world and producing a generation that will be subtly different phenotypically and biochemically different, as one study I read put it from previous generations."

৫. Aging সমস্যা : মনে রাখতে হবে যে, Aging হলো একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। Aging ছাড়াও আরও আছে ফ্যাক্টর। যার কারণে সেক্সুয়াল কমপ্লিকেশন দেখা যেতে পারে। যেমন- Smoking, Medication, Obesity, Stressetc কারণে সেক্সুয়াল প্রবলেম দেখা যেতে পারে। যদি কারো মাঝে একাধিক ফ্যাক্টর উপস্থিত থাকে তাহলে সেক্সুয়াল প্রবলেমের প্রতি তার VulnerabilityI বাড়বে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর সম্পর্কে সচেতন থাকলেও Aging এর বিষয়টা ইগনোর করে যাচ্ছি।

মূলত দেরিতে বিয়ে করার শারীরিক অপকারিতার থেকে আত্মিক অপকারিতা বেশি। আমি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আলোকে লেখাটি লিখিনি; বরং আমি এই লেখাটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি যে, এই পুঁজিবাদী সমাজ একটা জাহেলি সমাজ। এই সমাজ না বিজ্ঞান মানছে, না ইসলাম মানছে।

মুসলিমরা জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বিজ্ঞানকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেয় না, সিদ্ধান্ত নেয় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সামনে রেখে। আর এজন্যেই অনেক মুসলিম নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য দ্রুত বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এই পুঁজিবাদী সমাজ তাতেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আমাদের সবারই উচিত দেরি করে বিয়ে করার আত্মিক ও শারীরিক অপকারিতা সমাজের সামনে তুলে ধরা। -*অনুবাদক*

তথ্যসূত্র :

1. http://www.webmd.com/…/age-raises-infertility-risk-in-men-t…
2. http://www.theguardian.com/society/2008/…/07/health.children
3. http://www.webmd.com/…/age-raises-infertility-risk-in-men-t…
4. http://www.soc.ucsb.edu/…/article/aging-and-sexual-response…
5. http://www.askmen.com/dai…/austin_150/155_fashion_style.html
6. http://antiguaobserver.com/your-sexual-health-the-refracto…/
7. Seminars in Reproductive EndocrinologyVolume 9, Number 3, August 1991Sherman J. Silber, M.D.
8. Human Reproduction Update,2004[৮]The Guardian
9. http://www.babycenter.com/0_age-and-fertility-getting-pregn…
10. Breasts by Florence Williams
11. http://www.catholicworldreport.com/…/should_we_bring_back_y…

প্রেম-পিয়াসি যুবক যুবতির ভ্রান্ত বিশ্বাস

তারুণ্য যুবক যুবতিদের জন্যে যেমন আশির্বাদ তেমনি তা তাদের জন্য কালসাপস্বরূপ। যুবক যুবতিদের আল্লাহভীতি যেমন তাদেরকে ফেরেশতার মানে উন্নীত করে তেমনি এ সময়ের পদস্খলন তাদেরকে অধঃপতনের অতল গহ্বরের দিকেই বেশি তাড়িয়ে ফেরে। কিছু কিছু যুবক যুবতি এমন আছে, যাদের কাছে কোনো নীতি আদর্শের কথাই ছোঁয়ানো যায় না। তাদের কাছে ইসলামের কথা, কুরআন হাদিসের কথা কিংবা জাহান্নামের শাস্তির কথা বললে উল্টো তারা একগাদা শুনিয়ে দেয়ার জন্যে মুখিয়ে থাকে।

সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হলো, তারা নিজেরা যে ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত আছে তা স্বীকার করতে চায় না। উল্টো তাদের অবাধ মেলামেশার গায়ে বৈধতা(?)র প্রলেপ মাখতে নানা যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেয়। তারা পাল্টা প্রশ্ন করে যে, প্রেম এক পবিত্র জিনিস। নবি রাসূলগণও প্রেম করেছেন, তাহলে আমাদের প্রেম প্রেম খেলায় দোষ কোথায়?

কথিত ভালোবাসা আর প্রেমরঙ্গ খেলায় মত্ত যুবক যুবতিদের মাঝে নানা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল আছে। নিচে তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো–

ক. যুবক যুবতিরা বলে বেড়ায় যে, *'মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান!'* এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতের এক আধ্যাত্মিক বাক্যকে তারা অজ্ঞানতার কারণে একেবারে ভ্রান্ত পথে জুড়ে দিয়েছে।

খ. *'কারো মনে আঘাত দিলে সে আঘাত লাগে কাবার ঘরে।'* কথাটি ইসলাম যে মানবতার ধর্ম তা বোঝানোর নিমিত্ত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাই বলে একে নোংরা প্রেম খেলায় এঁটে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

গ. *'প্রেম স্বর্গীয় উপাদান। আর ভালোবাসা আসে স্বর্গ থেকে।'* এমন উক্তির কোনো প্রমাণ ইসলামে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঘ. *'নবীগণও প্রেম করেছেন। যেমন ইউসুফ-জোলেখা।'*

নাউজুবিল্লাহ! একজন পুণ্যাত্মা নবি সম্পর্কে এহেন ডাহা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা মোটেও সমীচীন নয়। বরং হযরত ইউসুফ (আ) কামুক নারীর খপ্পর হতে নিজেকে পবিত্র রাখতে নিজ শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করার মহাসত্য কাহিনি কুরআন মাজিদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

অথচ তাঁর সম্পর্কে এমন অপবাদ সুস্পষ্ট কুফরি আকিদা এবং আল্লাহর সম্মানিত একজন নবির চরিত্র সম্পর্কে চরম মানহানিকর। কারণ ইউসুফ (আ) যে কোনো ধরনের জৈবিক প্রেম ভালোবাসা থেকে মুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি তার চরিত্রে কোনো কলঙ্ক বহন করার চাইতে কারাগারে বন্দিজীবন বরণ করাকে অধিক পছন্দ করেছেন। এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে সূরা ইউসুফে।

যে কোনো নবী বা রাসূল সম্পর্কে কোনো খারাপ বা কটু মন্তব্য করা, তাদেরকে হেয় করা, তাদের মানহানি করা বড় ধরনের কুফরি।

এ ধরনের আরও বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস নামধারী মুসলিম যুবক-যুবতিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তারা বিবাহবহির্ভূত সম্পূর্ণ হারাম প্রেমকে বৈধতার লেবেল পরাতে এটাকে ধর্মের সাথে সংমিশ্রিত করে আজগুবি এবং ভিত্তিহীন কিছু প্রলাপ বকে থাকে।

বিবাহ বহির্ভূত প্রেম খেলাকে বৈধ প্রকাশার্থে যত আজগুবি কথা সমাজে রটিত আছে সবই ভিত্তিহীন। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। একমাত্র বিবাহোত্তর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসা বৈধ এবং নেকির কাজ।

এ প্রসঙ্গে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি প্রেম এবং মহব্বতের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে তখন আল্লাহ তায়ালাও তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টি বর্ষণ করেন। *[সহীহ বুখারী : ৬১৯, তিরমিজি শরীফ : ১৪৭৯] -অনুবাদক*

যে চিঠির প্রত্যেক লাইন থেকে অশ্রু ঝরে

মানুষের কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় হচ্ছে কথার পুনরাবৃত্তি। এ বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছি। কিন্তু কী করব, আমি যে বাধ্য হয়েছি আবারও এ নিয়ে লিখতে এবং বলতে!

মূলত একটি পত্র আমাকে বাধ্য করেছে চর্বিত চর্বণে। ডাকে পত্রটি নাম-ঠিকানা বিহীন আমার হাতে পৌঁছে। কাগজের পাতায় প্রেরকের জীবনবিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। মনে হচ্ছিল, তার লেখা প্রতিটি লাইন থেকে অশ্রু ঝরছে। যেন তার দগ্ধ হৃদয় থেকে ধূমায়িত বায়ু বেরিয়ে আসছে।

নাম-ঠিকানা উল্লেখবিহীন ঐ চিঠির প্রেরক লিখেছেন যে, তিনি একজন আত্মগোপনকারী সৎলোক। দীনের বিধান যথাসাধ্যভাবে পালন করে যাচ্ছেন। তার একটিমাত্র কন্যা দিন দিন অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়ে চলেছে। এখন পর্দা করাও ছেড়ে দিয়েছে। অসভ্যদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে তার। একটি দুষ্ট মেয়ে যতটুকু পৌঁছুতে পারে, ততটুকুও সে অতিক্রম করে ফেলেছে।

তার বর্ণনামতে এসবের কারণ হচ্ছে প্রথমত প্রাথমিক বিদ্যালয়। দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়। চিঠিতে তিনি স্কুল ও স্কুল-কলেজে পড়ুয়াদের ইচ্ছেমতো গালিগালাজ করে ধোলাই দিয়েছেন। যারা এই সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছেন, তিনি তাদের একেবারে পত্রের শেষ পর্যন্ত তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

আমি তার পত্রটি নিয়ে বেশ ভাবতে থাকি। অনেক ভেবেচিন্তে তার পত্রের জবাব লিখতে বসি। তাকে লিখে পাঠালাম যে, আমি জানি আপনি খুবই ব্যথিত। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি কী করতে পারি? আরও আগে আমার কাছে লিখে পাঠালেন না কেন? যখন সে কিছুটা আপনার নিয়ন্ত্রণে ছিল অন্তত তখন আমাকে লিখে পাঠালে একটা ব্যবস্থা হয়তো করতে চেষ্টা করতাম।

আমি লিখলাম যে, ভাই! এখন আপনার জন্যে কী করব বলুন! ফেতনার আগুন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে; প্রবল বন্যায় সব সয়লাব হয়ে গেছে; যা ধ্বংস হওয়ার সবই ধ্বংস হয়েছে; যা ডুববার, সবকিছুই ডুবে গেছে।

যদি রোগী মারা যাওয়ার পর ডাক্তারকে ডাকা হয় তাহলে ডাক্তার কী করতে পারবে? ভাই! আমি আপনার জন্যে কেবল শোক প্রকাশ এবং আল্লাহর কাছে এই মুসিবতে আপনার ধৈর্য প্রার্থনা করতে পারব।

তবে হ্যাঁ, আমি তার সহায়তায় ব্যর্থ হলেও অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পিছপা হব না। যদি আমার লজ্জা না থাকত এবং লোকটির ক্ষত দাগে ব্যথা বৃদ্ধির আশঙ্কা না হতো তাহলে বলতাম যে, এ পর্যন্ত গড়িয়েছে আপনারই কারণে।

সম্মানিত বাবা! সম্মানিত মাতা! এসব হয়েছে এবং হচ্ছে আপনাদেরই কারণে। আপনারাই সর্বপ্রথম লানত ও অভিশাপ পাওয়ার উপযুক্ত।

যদি আপনি (বাবা ও মা) ঘর ও কন্যার দায়িত্বে থাকেন, তাহলে আপনারা নিজের আনন্দ আর ইচ্ছা পূরণকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সন্তানদের প্রতি আপনাদের অবহেলাই তাদেরকে এ পথে নিয়ে এসেছে। মনে রাখবেন আপনার সন্তান একদিনেই কিন্তু এ পর্যায়ে যায়নি। এজন্য দীর্ঘদিন লেগেছে। এ দিনগুলোতে আপনার করণীয় কিছু কি ছিল না? বাড়ির কাজ এবং আপনার কাপড় সেলাই, সিনেমা দেখা, বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা সবই কি আপনার ঠিক ছিল না? আর এসব করতে গিয়েই তারা অবহেলায় অযত্নে বড় হয়েছে।

আমি অবশ্য আপনার ন্যায়ই মনোভাব পোষণ করি। তাহলো, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার স্কুল-কলেজ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে আমি ভালো বলছি না। পিতা, শিক্ষক, সন্তান, আইনপ্রণেতা সবাই নিজ নিজ কর্মের কারণে জিজ্ঞাসিত হবে। এরা সর্বশেষ যে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তাহলো এই কন্যা, যে তাদের কারণে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে তার সম্পর্কে।

আল্লাহ তায়ালা প্রবৃত্তির তাড়না মানুষের অন্তরে বপন করে দিয়েছেন। এর জন্যে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন। অন্যায় রোধ করার জন্যে বিভিন্ন বাধা-উপবাধা সৃষ্টি করেছেন। এসব ডিঙ্গিয়ে যদি অন্যায়ের সয়লাব হয়, তাহলে ধ্বংস তো হবেই।

দেখুন, নদীর ধর্ম হলো প্রবাহিত হওয়া। আপনি তাকে যতই বাধা দিবেন, সে তার প্রবহমানতা বহাল রাখতে প্রয়োজনে অন্যদিকে মোড় নিবে। নদীর প্রবাহিত হওয়ার নির্দিষ্ট পথ রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় নির্ধারিত পথেই নদী বয়ে চলে। কিন্তু বেড়ি বাঁধের কারণে নদীপ্রবাহ ব্যাহত হলে অন্য পথেই পানি প্রবাহিত হয়ে বাড়িঘর, ক্ষেত-ফসল সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তেমনি খোদাপ্রদত্ত জীবনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে বৈবাহিক সম্বন্ধ। পক্ষান্তরে অসৎ পথে কার্যসিদ্ধি হচ্ছে ফেতনা ও পাপাচার।

যদি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করা হয়, তাহলে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করে প্রাকৃতিক গতি থামিয়ে দেয়া হয়। ফলে সীমানা ডিঙ্গিয়ে বন্যা আসার প্রহর গুণার প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিইবা থাকতে পারে!

ধাঁধার জাল

আমরা যুবতিদেরকে নানা ছুঁতা দেখাই। তাদেরকে বলি যে, এই বয়সে বিবাহ দরকার নেই! আরেকটু পেকে নাও! তাদেরকে এই যুক্তিও দেখাই যে, এখনকার যুবকরা কেউ ভালো নেই। তারা বিয়ের বিতৃষ্ণা ভাব নিয়ে হারাম পন্থায় কার্যরত।

অন্যদিকে যুবকদের বলি যে, বিয়ে খুব কঠিন বিষয়। মেয়ের ভরণপোষণ, কয়েকদিন পর বালবাচ্চা হলে আরো ঝামেলা; সামাজিকতা ও শ্বশুরপক্ষের আত্মীয়স্বজন– আরো কত কী! আমরা তার সামনে তুলে ধরি শত ধাঁধার ছড়ানো জাল। অথচ হারাম পথ খুবই সহজ। এর জন্যে শত আহ্বায়ক ও উদ্দীপক রয়েছে। ফলে বৈবাহিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। গুনাহের আধিক্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কন্যারা যাঁতাকলে পিষ্ট এবং ল্যাম্পপট্যের ছায়ায় অবলার মতো বলি হচ্ছে।

একজন যুবক প্রথমে কোনো যুবতির সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। উভয়ের মাঝে যৌনসম্ভোগ উদ্‌যাপিত হয়। তারা অন্যায় কাজে একসাথে শরিক থাকে। কিন্তু একটা সময়ে স্বার্থ ফুরিয়ে এলে কিংবা যৌনস্বাদ নেয়া শেষ হলে যুবক আস্তে করে কেটে পড়ে। নিজেকে পূতপবিত্র রাখার ভাব জাহির করে।

তখন যুবতি হয়ে পড়ে একা। সে তার চোখের সামনের সব অন্ধকার দেখে। সব অপরাধের বোঝা তার কাঁধে চেপে বসে। গুনাহর ফল গর্ভে ধারণ করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। ওদিকে যুবক তখন তওবা করে। সমাজের লোক তার তওবা মেনেও নেয়। তার অপরাধের কথা ভুলে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, আমাদের সমাজে যুবতির তওবা সমাজে গৃহীত হয় না। চিরকালের জন্যে সে অভিশপ্ত হয়ে পড়ে। আবার এই যুবকটিকেই বিয়ে করতে বললে সে অন্তত তার ভোগের মেয়েটিকে এড়িয়ে চলে। সে মনে করে যে, যার স্বাদ নেয়া হয়ে গেছে, তার মাঝে আমার জন্য আর কী স্বাদ বাকি আছে! সে তখন নতুন স্বাদের নেশায় মাতাল। সে তখন চায় নয়া স্বাদ।

কিন্তু তখন এই যুবতি কী করবে? তার জন্যে যে বিবাহ নিষিদ্ধ! অপরাধ বৈধ। কামনা-বাসনা উদ্দীপ্ত। এ পথে অন্তরায় উত্তেজিত।

আপনারা হয়তো বলবেন যে, আমরাই কি বিবাহ নিষিদ্ধ করেছি?

আমি বলব, হ্যাঁ! আপনারাই এ পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন। তবে শক্তি প্রয়োগ করে নয়; বরং কাজের মাধ্যমে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, পনেরো বছর বয়সে যুবক-যুবতিদের মাঝে কামনা-বাসনার সঞ্চার হয়। ইসলামি শরিয়তের নির্দেশনা এ গবেষণার কাছাকাছি। মূলত শরিয়তের দৃষ্টিতে ছেলে বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হয় চৌদ্দ বছর বয়সে আর মেয়েরা নয় পেরুলেই তাদের মধ্যে মা হবার যোগ্যতা চলে আসে। এটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা। গবেষণার প্রতিবেদন হলো, এ পনেরো বছর থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত প্রায় দশ বছর যৌবনজোয়ার থাকে। কিন্তু এ সময়ে কি তারা বিয়ে করতে পারে? কিভাবে পারবে? শিক্ষাব্যবস্থাপনা তাদের এ বছরগুলোতে ক্লাসের পাঠ অধ্যয়নে বসে থাকতে বাধ্য করে। এরপর ডক্টরেট অর্জনের জন্যে ইউরোপ-আমেরিকা সফর করলে বয়স ত্রিশের কোটায় গিয়ে হামাগুড়ি দেয়!

তাহলে বলুন, কিভাবে তারা বিয়ে করতে সমর্থ হবে?

বিয়ে-শাদির ব্যাপারে ফিকির করলে শত চিন্তা মাথায় এসে ঘুরপাক খেতে থাকে। কোথায় পাবে বিয়ের অর্থ? সে একজন উচ্চ বংশের লোক। তার জন্যে দামি জামাকাপড় প্রয়োজন! কিন্তু পয়সা কোথায়? এভাবে ধনসম্পদ উপার্জন করে চল্লিশের দিকে বিয়ের কথা ভাবা যায়। অথচ এ সময়ে তার ঔরসজাত ছেলের বয়স হওয়ারই কথা ছিল বিশ বছর।

একটি বিষয় ভেবে দেখুন তো, অর্থসম্পদ হাতে এলেও কি ছেলেমেয়ের বাবারা বিয়েতে সম্মতি দান করেন? করেন না; বরং তাদের সামনে নানা ধাঁধার জাল বিস্তার করে দীর্ঘসূত্রিতার অবতারণা ঘটাতেই তারা বেশি পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে ছেলের চারিত্রিক অধঃপতনের ব্যাপারে যদি কোনো নালিশ আসে তখন তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলে দেয় যে, 'এই বয়সে একটু আধটু দুষ্টুমি করেই থাকে। ও কিছু না! বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে!'

নাটের গুরু কে

আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েদের বাবারাই হলেন যত সমস্যার মূল হোতা। তারাই আসল নাটের গুরু! তারা মেয়ের জন্যে বৈধ পথ ছাড়া সব পথই সহজ করে রাখেন। তাদেরকে সাজসজ্জা দিয়ে পর্দাহীনভাবে রাস্তায় নামিয়ে দেন। শাসনের লাঠি শিথিল করে দেন। ভালো কোনো পাত্রের সন্ধান এলে তাদের সাথে এমন আচরণ দেখান, যেন প্রবল প্রতাপে ইসরাইলে মার্কিন হামলা করে বসল! কোনো স্থান থেকে প্রস্তাব আসলে অযথা টালবাহানা শুরু করে দেন। ভারী দেনমোহর ও অনুষ্ঠানের বোঝা ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দেন। তারা অবলীলায় ভুলে যান আল্লাহ তায়ালার বিধান ও নির্দেশ। অথচ কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ আল্লাহর প্রকৃতির ওপর। যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই প্রতিষ্ঠিত দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। *[সূরা রুম : ৩০]*

মূলত আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে সরল সহজ করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অভিভাবকদের তালে পড়ে কিংবা পরিবেশের ফাঁদে পড়ে মানুষ দীন শরিয়ত ভুলে যেতে বাধ্য হয়। তাই এর জন্য দায়ী ব্যক্তিকেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

প্রত্যেক নবজাত শিশু ফিতরাত তথা ইসলাম বা স্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতার ওপরই ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু তার পিতা-মাতা বা ইসলামবিরোধী পরিবেশে লালন-পালন করার মাধ্যমে তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকে পরিণত করে।

মেয়ের অভিভাবকের অযথা আব্দার শুনে এক পর্যায়ের ছেলেপক্ষ বিরক্ত হয়ে পরাজয় মেনে নেয়। কখনোবা সে ধৈর্যের সাথে এসব রুসুমাতের মোকাবিলা করে। এই কালো দিবসের জন্যে ছেলে তার জীবনের সঞ্চিত সব পয়সা ঢেলে দেয়। আর বৈবাহিক জীবনে পদার্পণ করে খালি হাতে। ফলে প্রথম দিন হতেই শুরু হয়ে যায় ঝগড়া-বিবাদ।

কোনো সংসারে তর্ক-বিবাদের সূচনা হওয়ার অর্থ হলো যাবতীয় শান্তি ও কল্যাণের বিলুপ্তি ঘটা। কারণ তর্কবিতর্কের হাত ধরেই বৈবাহিক জীবনে কিংবা সংসারে প্রবেশ করে অশান্তির বিষধর সাপ।

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, ছেলের দীনদারি, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নীতি-নৈতিকতার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে। তিনি আদেশ দিয়েছেন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা যথাসম্ভব সহজ পন্থায় সেরে নিতে। কিন্তু আমরা আদর্শ সমাজ সংস্কারক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ভুলে গিয়ে চলছি নিজের ইচ্ছায়। ইচ্ছাটাকে কেউ কেউ শরিয়ত কিংবা দীনের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই বলব, আমরাই সকল নাটের গুরু!

পবিত্রতার প্রাচীরে মিসাইল হামলা

নারী পরম সম্মানিতা। ইসলাম তাদেরকে মাতৃত্বের আসন প্রদান করেছে। তাদের পদতলে সন্তানের বেহেশত ঘোষণা করেছে। তাই আদর্শ সন্তান ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন নারীর সতীত্ব রক্ষা করা। কিন্তু আমরাই নারীর সতীত্ব রক্ষার প্রাচীরটি নড়বড়ে করে দিয়েছি। তাতে আমরাই চালিয়েছি মিসাইল হামলা।

অনেক সাধারণ মানুষের বক্তব্য হলো, আজকের আধুনিক যুগে কি এভাবে বিবাহ সম্পাদন সম্ভব?

তাদের জিজ্ঞাসার সহজ জবাব হলো, হ্যাঁ! অবশ্যই সম্ভব। আমি এভাবেই করেছি। আমার পাঁচটি মেয়ে রয়েছে। তাদের জন্যে যখন কেউ প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তখন আমি ছেলের আচার আচরণ ও ধর্মভীরুতা লক্ষ করেছি। তাতে সন্তুষ্ট হলেই বলে দিয়েছি, ঠিক আছে দেনমোহর নির্ধারণ করে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করুন। আমি সাধারণ প্রথা-রুসুমাতের ধার ধারিনি। মহিলাদের কথা বলার সুযোগও দেইনি; বরং শরিয়তের নির্দেশনা মোতাবেক সব কিছু সম্পাদিত হয়েছে। সাথে সাথে বিবেক-বুদ্ধি ও পরামর্শকেও কাজে লাগিয়েছি। আমার আয়োজনের কারণে আমিও লজ্জিত হইনি, আমার মেয়েদেরও লজ্জিত করিনি।

আমরা কিভাবে নারীর সতীত্বের দেয়াল নড়বড়ে করেছি কিংবা কোনো ক্ষেত্রে তা গুঁড়িয়ে ধ্বংস করেছি তা বোঝা খুব সহজ। আমাদের মিসাইল হামলায়ই যে নারীর পবিত্রতার দেয়ালে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে তা তলিয়ে

দেখার মাথা খাটাতে চাই না। উল্টো যত দোষ নন্দঘোষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেই যেন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

এ ব্যাপারে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে চাই। তাহলো–

১. খোলামেলা চলাফেরা : অনেক বাবা আছেন, যারা মেয়েদের খোলামেলা পথে ছেড়ে দেন। পথচারী সবাই তাদের প্রতি ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে; এমনকি গাধা-কুকুরও! কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় মেয়ে দেখতে চাইলে তারা নানা আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং চেঁচিয়ে ওঠেন পর্দা! দীনদারি! রুসুমাত! ইত্যাদি নিয়ে।

আমরা যুবকদের সামনে শরিয়তসম্মত বিবাহের পথে অন্তরায় তৈরি করে রেখেছি। পক্ষান্তরে তাদের সামনে শরিয়ত-নিষিদ্ধ সমস্ত বন্ধন খুলে দিয়েছি। শরিয়ত পর্দা ও পবিত্রতার বিধান আরোপ করেছে। অথচ আমরা আমাদের সন্তানকে সেই আলো থেকে বঞ্চিত করেছি। ফলে তারা বলে যে, আমরা পর্দাপ্রথায় ফিরে আসব? বন্দি জীবনে আবদ্ধ হব? এভাবে পবিত্রতার প্রধান প্রাচীরটি মিসাইল হামলার শিকার হয়ে ধসে পড়ে!

২. অবাধ মেলামেশা : শরিয়ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম করেছে। ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে যে, নির্জনে ছেলেমেয়ে একত্র হলে তাদের তৃতীয় সহচর হয়ে থাকে শয়তান।

নারীবাদীদের সামনে এসব শরিয়তি কথা বলতে গেলে তারা অবলীলায় এর জবাবে বলে যে, এ কেমন আচরণ? নারীর প্রতি এ কেমন তুচ্ছ মনোভাব? তাদেরকে কেন ইসলাম বিশ্বাস করতে চায় না? কেন নারীকে স্বাধীনতাবঞ্চিত করা হবে? কথিত নারীবাদীরা উল্টো অভিযোগের ডালি সাজিয়ে বসেন যে, আপনারাই তো হলেন নারীবিদ্বেষী!

আমরা বলি, আল্লাহর কসম! আমরা নারীবিদ্বেষী নই। আমরা বরং নারীহিতৈষী: তাদের সংরক্ষক। আমরা সমাজ ও পুরুষের জুলুম থেকে তাদের উদ্ধার করতে চাই। কিন্তু তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করেনি। আমাদের কর্মপন্থা বাস্তবায়নও করেনি।

মূলত কথিত নারীবাদীরাই নারীদেরকে প্রতারিত করেছে। তারাই একা একা বাইরে নামিয়ে দিয়েছে। তারা ডাক্তারের সামনে মুহাররাম ছাড়া কাপড় খুলে দিচ্ছে। বিচারালয়ে মকদ্দমার জন্যে দেহ উন্মোচন করে ফেলছে। এভাবে হাটে-ঘাটে, বন্দরে-কন্দরে, কলেজে-ভার্সিটিতে, সফরে-বাড়িতে এবং পার্কে ও নদীর পাড়ে তাদের দেহ প্রসাধনীর মতো খুলে দিয়েছে!

কথিত প্রগতিবাদীরা আরো বলে বেড়ায় যে, এটাই আধুনিকতা। মূলত এখানেও আদর্শকে পরাজিত করেছে কথিত ধ্বজাধারীরা। এভাবে তারা পবিত্রতার দ্বিতীয় প্রাচীরটিও ভেঙে ফেলেছে।

৩. লজ্জাবোধের তিরোধান : যুবক-যুবতির পবিত্রতা রক্ষার তৃতীয় প্রাচীর হলো লজ্জা। বর্তমানে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লম্পট যুবকও অপরাধ করে বুক ফুলিয়ে গর্ব করে। বন্ধুদের কাছে হেসে, তামাশা করে অপরাধের কাহিনী শোনায়। তবে জিজ্ঞেস করা হলে অস্বীকার করে। এ সমস্ত ঘটনা এখন অহরহ ঘটছে। পাঠকবৃন্দ বিভিন্নজনের লেখায় এবং পত্র-পত্রিকায় অনেক ভয়াবহ বর্ণনাও পড়ে থাকবেন। তবে আফসোসের বিষয় হলো, এগুলো এতটাই ফলাও করে প্রচার করা হয় যে, এখন আর অপরাধ মনে হয় না। নির্লজ্জভাবে কলমে তোলা হয়, সংবাদপত্রে ছাপা হয় এবং টেলিভিশনে প্রচার হয়। এভাবে তৃতীয় প্রাচীরটিতেও শক্ত মিসাইল হামলা হওয়ায় তা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

৪. রোগের নির্ভয়তা : যুবক-যুবতিদের অন্যতম পবিত্রতা রক্ষাবাঁধ ছিল রোগের ভয়। অধুনা কিছু চিকিৎসক উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ তুলছেন যে, পাপাচারীরা! তোমাদের ভয় নেই। কারণ, আমাদের কাছে এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা রয়েছে। তোমরা অবৈধ উপায়ে যে কোনো রোগ সৃষ্টি কর না কেন, আমরা প্রতিহত করব। আমরা আছি তোমাদের পাশে। [ইদানীং যুবক-যুবতিদের অবৈধ যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার সাময়িক কনডম, চব্বিশ ঘণ্টা কিংবা এক সপ্তাহের মধ্যে নির্দিষ্ট পিল বাজারজাত হয়েছে। সুতরাং নো রিস্ক! অন্যদিকে অবৈধ যৌনমিলনে সংক্রমিত মরণব্যাধি এইডস-এর প্রতিষেধকও ইতিমধ্যে নারীবাদীদের কুশলে আবিষ্কার হয়ে গেছে] অতএব তোমরা এগিয়ে যাও অবলীলায়!

ব্যাস! যুবক-যুবতিরা বিড়ালের শুঁটকির ডোলে পড়ার মতো অগ্রসর হতে থাকল। এক পর্যায়ে চতুর্থ রক্ষাবাঁধটিও মিসাইল হামলায় খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল।

৫. প্রশাসনিক শৈথিল্য : পবিত্রতার পঞ্চম রক্ষাপ্রাচীরটি ছিল প্রশাসনের ভয়। একসময় রাষ্ট্র সৎকাজের নির্দেশ দিত এবং অন্যায় কাজে বাধা দিত। কিন্তু কালের আবর্তনে সব পাল্টে গেছে। শাস্তিবিধি ফ্রান্স থেকে ধার নেয়া হয়েছে। যারা পাপাচারের কারণে সাত বছরে জার্মানের কাছে তিনবারই পরাজিত হয়েছিল। ফলে আমাদের সংবিধানে অবৈধ যৌনতা একরকম বৈধতা পেয়ে গেল। ব্যভিচারিণীর বিরুদ্ধে স্বামী ছাড়া অন্যের অভিযোগ

বাতিল করা হলো। মা-ছেলে, বাবা-মেয়ের যৌনাচারের শাস্তি সাধারণ চুরি থেকেও লঘু করা হলো!

কী আর করা! আমরা নীরবে বসে রইলাম। ওলামা-সুলাহা, মুফতি-নবাব, বিচারক সবাই নীরবতা অবলম্বন করলেন। ফলে পঞ্চম বাঁধটিও মিসাইল হামলা হওয়ায় সৃষ্ট বানের পানির তোড়ে ধসে গেল।

৬. ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতি : পবিত্রতার সবচেয়ে শক্তিশালী ও রক্ষণশীল প্রাচীর ছিল আল্লাহর ভয় ও জাহান্নামের ভয়। কিন্তু আমরা নতুন প্রজন্মকে দীনি শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়েছি। আল্লাহ ও জাহান্নামের ভয়মুক্ত মনমানসিকতা গড়ে দিয়েছি। ফলে একজন যুবক মুসলিম হয়েও মসজিদের পথ চেনে না; খ্রিস্টান হয়েও খুঁজে পায় না গির্জার পথ।

মূলত যুবক-যুবতিদের পবিত্রতার এটিই ছিল সর্বাধিক মজবুত ভিত। কিন্তু তা-ও ধসে গেল। আমাদের অতি আধুনিক দাবিদার প্রগতিবাদীরা যুবতিদের মাঝে ঘোষণা দিল : যাও! বেরিয়ে পড়। ব্যাস, তারা পথে নেমে পড়ল। রাস্তায় এমনভাবে চলাফেরা শুরু করল যে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে নিজের ঘরে বাবার সামনেও একজন নারী এ পোশাকে আসতে লজ্জা পেত। এভাবে আমরাই সন্তানদের পবিত্রতার দেয়ালে মিসাইল হামলা করে তা ধসিয়ে দিয়েছি।

সব ধর্মই নারীকে শালীন হওয়ার শিক্ষা দেয়

আল্লাহর কসম! ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং পৃথিবীর সব ধর্মই নারীদের অঙ্গ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়। যেখানে ফেতনার আশঙ্কা আছে, সেখানে দেহ প্রকাশ অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়।

আমি সিরিয়ার এক গির্জায় নারীসংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে দেখেছি, যারা সেখানে উপাসনায় গমন করবে, তাদের মাথার চুল লম্বা স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং চেহারায় কোনো ধরনের পালিশ করা যাবে না। অথচ আজ মোড়ে মোড়ে গড়ে ওঠেছে বিউটি পার্লার। শুধু নারীদের জন্য নয়, পুরুষদেরকে স্মার্ট করে তোলার জন্যও আছে জেন্টস পার্লার। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের যুবক-যুবতিরা কোনো ধর্মের অনুশাসনই মানে না। তা না হলে তো অন্তত যে কোনো ধর্মের আদেশ মেনে নিলেই এভাবে খোলামেলা বিচরণ সম্ভব হতো না।

আমারা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, ধীরে ধীরে নারীদের পোশাক একেক আঙুল করে ছোট হচ্ছে। আর যখন তারা সমুদ্রতীরে ভ্রমণে বের হয়, তখন দেহে কখনো এক টুকরো বিকিনি থাকে কিংবা কোনো পোশাকই থাকে না। এই হলো যুগের হাল। তাহলে বলুন তো, যুবক-যুবতির অপরাধ কোথায়?

একজন যুবকের হৃদয়ে যৌনচাহিদা প্রবলভাবে উপলব্ধি হয়। কিন্তু সে বিয়ের সব পথ রুদ্ধ পায়। পক্ষান্তরে ব্যভিচারের সদর দরজা দেখে খোলা। ফলে তার কাছে যৌনসম্ভোগ বড়ই স্বাদের অনুভূত হয়। আর ব্যভিচারিণীরাও থাকে সবখানে হাজির। তাহলে একজন যুবক আর কিভাবে নিজেকে সামাল দিতে পারবে? কিভাবে পুস্তক অধ্যয়নে মনোযোগ বসাতে সমর্থ হবে?

এটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। এর প্রতিবিধানে প্রশাসন, সংগঠন, জ্ঞানসাধক, কলম চর্চাকারী এবং বৃহত্তর নারীগোষ্ঠীর উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে অসংখ্য নারী নির্যাতনের শিকার। অবলা নারীরা নিষ্ঠুরভাবে বলি হচ্ছে। সবাই একযোগে বিহিত ব্যবস্থাগ্রহণ করলে এ সমস্ত মজলুম নারীর পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

সব ঘর পুড়ে হবে ছাই

আজ এক পত্রলেখকের মেয়ে নষ্টা হয়েছে। সে বাবা-মা কিংবা অভিভাবক কারো কথাই শুনছে না। উল্টো তাকে কিছু বললে সে বলল তার নিজের প্রাণের জন্যই তা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়! মনে রাখবেন, আমাদের অবহেলার দরুন এই বিষক্রিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সবদিকে। এর প্রভাব আপনার আমার পর্যন্তও পৌছবে। ঘরে-ঘরে লেলিহান শিখার মতো ছড়িয়ে পড়বে। সব ঘর পুড়ে হবে ছাই, হবে ভস্ম।

তবে কি আমরা নীরবে বসে থাকব! সর্বধ্বংসী এ অগ্নি কি নিরোধ করব না! নাকি জ্বলন্ত শিখায় আরও ইন্ধন যোগাতে থাকব!

তাহলে কিভাবে আমরা অগ্নি থেকে রেহাই পাব?

বলুন! জবাব দিন! হে বিবেকবান সম্প্রদায়!

নাকি বিবেকের কপাটে খিল মেরেছি সবাই! বিবেকের লোহার কপাটে কি ঝং ধরেছে?

আসুন সবাই মিলে এই বদ্ধ কপাটের খিল ভেঙে ফেলতে অগ্রসর হই। আসুন, আমাদের দেশ ও জাতিকে রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হই। আসুন কথিত নারীবাদী ও প্রগতির ধ্বজাধারীদের সম্পর্কে সজাগ হই। আসুন সবাই নিজ ছেলেমেয়ের গতিবিধি নিরীক্ষা করি।

পাগলের মাথা খারাপ

'আল-মুসলিমুন' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। এ সংখ্যাটি ছিল একটি বিশেষ সংখ্যা। এতে সমকালীন বেশ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়। এতে আমার একটি প্রবন্ধও গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়েছিল। সামাজির নানা অপকর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি পাঠ করে অনেকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, বুঝলাম এটি একটি ব্যাধি। কিন্তু এর প্রতিষেধক কী?

হ্যাঁ, আগ্রহোদ্দীপক পাঠকের সেই প্রতিষেধক সম্পর্কেই আজকের কলম ধরা। এক্ষেত্রে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রতিষেধক আমাদের কাছেই আছে। আমরা অতি সহজেই তা গ্রহণ করতে পারি। অথচ তার খোঁজে, তার অন্বেষায় আমরা দূরদূরান্তে ছুটে চলি।

মানুষের ধারণা প্রান্তিকতায় অবস্থান করে। কারও কারও চিন্তাধারা আধুনিক মানের। তাদের ধারণা হলো, অপকর্ম ওপেন সিক্রেট হয়ে গেলে আর কেউ অপকর্ম করবে না। বিশেষত যুবক-যুবতির জন্যে যৌনদুয়ার অবাধভাবে খুলে দিলে এর প্রতি কারো আর আকর্ষণ থাকবে না। তখন আর এসব অপকর্মও আর হবে না।

কী আজগুবি ধারণা! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মাথা হতে কিভাবে যে এমন অহেতুক ও আজগুবি কল্পনা পয়দা হয়, তা ভাবতেই আমার রক্ত হিম হয়ে আসে। নাকি আমরা সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছি। নাকি পাগলের চেয়েও জঘন্য? তাহলে কি পাগলের মাথা খারাপ পর্যায়ে? পশুর মতো প্রকাশ্যে অপকর্মের পথ খুলে দিলেই কি এসব অপকর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?

মহামারি ভাইরাসের প্রতিষেধক

তথাকথিত আধুনিক দাবিদার ও কথিত নারীমুক্তির মিছিলকারীরা যুক্তি দেখায় যে, এসব কাজে দমন-পীড়ন ও প্রতিহতকরণ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। অপরদিকে পাপাচার থেকে পৃথিবীর কোথাও কোনো কালের মানুষ

মুক্ত থাকেনি। তাই নিজেরা গোপনে কাজ সেরে ফেলার চেয়ে বিচারকের কাঠগড়ায় প্রকাশ পাওয়াই ভালো।

এ ব্যাপারে তাদের খোঁড়া যুক্তিও কম নয়। তাদের সাফ কথা হলো, ঘরের ময়লা রাখার জন্যে দরজার সামনে ঝুড়ি রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো যেন ময়লাগুলো রুমের মধ্যে ছড়াতে না পারে। এর দ্বারা ঘরের সামনে মোটেই ময়লা জমানো কারো উদ্দেশ্য থাকে না। তেমনি এই যৌনপথের খিল খুলে দিলেই শহর-নগর পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

আবার অনেকের থিওরি এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাহলো, যুবক-যুবতি সমস্যা নিরসনের একটিই মাত্র পথ রয়েছে। তাহলো, আধুনিকতা পরিহার করে সাধারণ জীবন ধারণে অভ্যস্ত হতে হবে। যুগ ও বাস্তবতার তারা কোনোই তোয়াক্কা করবে না।

এক্ষেত্রে আমার মতামত হলো, এই থিওরিধারীদের মতামতও যথার্থ নয়। কারণ, এ চিন্তাধারায় আকস্মিকতার ভাব রয়েছে। কোনো কাজে সফল হতে চাইলে আকস্মিক বা তরিৎ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কেননা, এই ফেতনা একদিনে ছড়ায়নি; বরং তা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে। ক্রমে ক্রমে নারীরা কামিজ খাটো করেছে; শর্ট কামিজ, অর্ধউলঙ্গ পোশাক পরে আজকের দৃশ্যপটে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমি এসব বন্ধুকে বলছি না যে, এখনই আপনাদেরকে সম্পূর্ণ পর্দায় প্রবেশ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, যারা সংস্কার কাজে এগিয়ে আসতে চান, তাদের বলতে চাই যে, চিন্তাচেতনা ও মানসিক ভাবনা জমিন থেকে করতে হবে; মুয়াজ্জিনের আজানখানা থেকে নয়। তাছাড়া সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগসম্ভব ও বাস্তবমুখী কাজের উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে কোনো মিথ্যাকে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে পারলেই তা সত্য হয়ে যায় না। এমনিভাবে উদাহরণ ধরে ধারণামূলক ছন্দ তৈরি করলেই তা ছন্দময় বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই প্রকাশ্যে যৌনদুয়ার খুলে দিয়ে সমস্যা নিরসনের চিন্তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি এ মহামারি ভাইরাস নিরাময়ে কয়েকটি প্রেসক্রিপশন পেশ করতে চাই। তাহলো—

প্রথমত. মনে রাখবেন যে, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার মতো ব্যভিচারও একটা জঘন্য অপরাধ। জগতের কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তিই একে ভালো বলতে পারে না। যদি তথাকথিত যুক্তিবাদীদের যুক্তির আলোকে ব্যভিচারের পথ খোলা রাখা হয়, তাহলে তো চুরি, ডাকাতি কিংবা হত্যার পথও খোলা রাখতে হয়! কারণ মানবসৃষ্টির পর থেকে কোনো কাল, কোনো স্থানই তো এ অপরাধ

থেকে মুক্ত থাকেনি। তবুও কেন আমরা প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে এগুলোর বৈধতার কথা বলি না?

দ্বিতীয়ত. যদি নারীবাদীদের কথামতো ধরে নিই যে, যেনা হত্যার মতো অপরাধ নয়। কারণ, হত্যা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে হয় না। পক্ষান্তরে যেনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু'পক্ষের সম্মতির প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। আমি বলব যে, আরে! এ যুক্তির আলোকে তো দেশের প্রতিটি যুবককে ইচ্ছামতো নারীভোগের স্বাধীনতা দিতে হয়! নির্দিষ্ট কোনো মেয়ে কলিমুদ্দির জন্য বৈধ থাকবে; কিন্তু ছলিমুদ্দির জন্যে থাকবে না; এমন হতে পারবে না। তাই প্রতিটি অঞ্চলে পুরুষের সংখ্যানুপাতে ব্যভিচারিণীও বিদ্যমান থাকতে হবে। বাস্তবে কি আদৌ কোনো মানবসমাজ এটি গ্রহণ করে নিবে? অতএব, একথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, এই খোঁড়া যুক্তিবাদীদের মতলব খারাপ!

ধরে নিই যে, মিসরের রাজধানী কায়রো শহরে যদি আড়াই মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। পাশাপাশি যদি কথিত যুক্তিবাদীদের কথায় মেনে নিই যে, যৌনদুয়ার খুলে দিতে হবে; তাহলে তো তাদের মধ্যে অন্তত চার লাখ পুরুষ আছে। এই পুরুষদের জন্যে চল্লিশ হাজার অসতী নারী থাকাও কি জরুরি নয়? কোনো ভদ্র মানুষ কি দাবি করতে পারে যে, কায়রোতে চল্লিশ হাজার এ জাতীয় নারীর অস্তিত্ব থাকবে?

আমরা এই সংখ্যা যোগাব কোত্থেকে? চল্লিশ হাজার পরিবারকে অপদস্থ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পন্থায় এই সংখ্যা কি পূরণ করা সম্ভব? তবে কি আমরা সেই জাতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হব, যারা অপকর্মের প্লাবনে দৈহিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত? তাদের কাছে কি নিজেদের মান-মর্যাদা, গর্ব-অহমিকা বিলীন করে দেব?

তৃতীয়ত. যদি কথিত আধুনিক দাবিদার নারীবাদী ও প্রগতির ঢেঁকিদের মতের সাথে একমত হয়ে উল্লিখিত সংখ্যা পূরণ কোনোভাবে সম্ভবপরও হয়, তাহলে এই কর্ম আয়োজনে যুবকরা বিবাহের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়বে। সাংসারিক জীবনে ধস নেমে আসবে। ঘরের কন্যারা বিয়ে ছাড়া নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে।

কথা হলো, এই ব্যভিচারিণীদের নিয়ে আমরা কী করব? আমরা কি আশ্রয়কেন্দ্র বা উপাসনার দ্বার খুলে দেব, যেখানে তাদের ফেলে আসব? এরপর কি তারা আগন্তুক, পথচারী, পাদ্রী ও সংসারত্যাগীদের ভোগ-

প্রয়োজন মেটাবে? অথবা নির্দিষ্ট স্থানে পুরুষের বাজার বসানো হবে, যেখান থেকে নারীরা যৌনক্ষুধা নিবরণ করতে পারবে?

প্লিজ, আপনারা এই বিবরণকে ভিন্ন চোখে পর্যালোচনা করবেন না। কারণ, যে রোগ ধরিয়ে দেয় এবং সেই মতে প্রেসক্রিপশন দেয়, দোষ তার নয়; বরং অপরাধ হলো ব্যাধির।

আমার এই বর্ণনা যদি কারো কাছে অতৃপ্তিকর মনে হয়, তাহলে বাস্তব ঘটনা ও বর্ণনাগুলো অবশ্যই আরও বিরক্তিকর হওয়ার কথা।

জৈবিক রোগ প্রতিরোধের ধাপ-উপধাপ

এবার আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, যদি যৌনদুয়ার ওপেন রাখতে আপনাদের আপত্তি হয়, তাহলে আপনার কাছে এর প্রতিরোধক কী?

জবাবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলব যে, এই জৈবিক ব্যাধি প্রতিরোধের কয়েকটি ধাপ-উপধাপ রয়েছে। কারণ, বর্তমান সমাজ 'রোগ-ব্যাধির' ছড়াছড়িতে পচা ঘায়ের মতো নির্দয়-নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছে। এজন্যে প্রথম ধাপে রোগ প্রতিরোধ, দ্বিতীয় ধাপে পুনরাবৃত্তি প্রতিহত, তৃতীয় ধাপে ব্যাধি সুস্থকরণ এবং চতুর্থ ধাপে দৈহিক শক্তি অর্জন ও রক্ষণের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তির পথ রোধ করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধের প্রথম ধাপ : যৌনরোগ প্রতিরোধ একদিনেই সম্ভব নয়। এর জন্য কয়েকটি ধাপ-উপধাপ অতিক্রম করতে হবে। এ পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করছি। প্রথমত এর জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর নৈতিক উন্নতি ও চারিত্রিক অগ্রগতি সাধন করতে হবে। কারণ, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম পুলিশের আশ্রয় নেয়া হয়। কোনো এলাকায় যদি পুলিশ না থাকে অথবা কারও নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার কারণে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তাহলে অপরাধ এবং অপরাধীকে রোধ করার কেউই থাকবে না।

আমার কাছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনীর অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, এমন অনেক অপরাধী আছে, যাদের অপরাধের ধরন ও সেই অপরাধীর পূর্ণ পরিচয় জানেন। কিন্তু তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনার সাংবিধানিক কোনো সুযোগ নেই। সাংবিধানিক পদক্ষেপ নেয়ার মতো কোনো আইন না থাকার কারণে এসবের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারেন না। কখনও নষ্টা নারী সরাসরি ধরা পড়লেও কিছু বলার সুযোগ থাকে না। উল্টো তাদের

ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্ন বিধান। তাহলো, এসব অপরাধী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাদের সুস্থতার জন্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

কথা হলো, এই ব্যভিচারীদের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক আইনি সুযোগ না রেখে উল্টো তাদেরকে সুস্থ করার আইন সংবিধানে থাকবে কেন? তাহলে সুস্থ হয়ে যেন তারা পুনরায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে সেজন্যেই?

এই অপকর্মগুলো মূলত বিভিন্ন শক্তি, ব্যক্তি, সংগঠন ও সংবিধানের অধীনে হয়ে থাকে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বটা বেশ জটিল ও কঠিন। কারণ, তাদের একদিকে থাকে সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রলোভন, অপরদিকে সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীনের ধৈর্য ও ঈমানি জযবা। এ কারণে কর্তব্য হলো, অভিজ্ঞ, বয়োবৃদ্ধ, ধার্মিক ও চরিত্রবান ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দেয়া এবং বেতন ছাড়াও তাদেরকে ভিন্ন অনুদান প্রদান করা। যখন তারা এই অর্থ গ্রহণ করবে, তখন তাদের শক্তি-সাহস প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

যেহেতু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো কোনো অসৎ সদস্যের ছত্রছায়ায় অপরাধকর্ম হয়ে থাকে আবার অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষমতাও তাদের হাতে, তাই এমতাবস্থায় বেতনের বাইরে বড় একটা অঙ্ক হাতে এলে প্রচলিত আইন বাস্তবায়নে তারা পিছপা হতে পারবে না। পক্ষান্তরে তাদের অর্থনৈতিক অভাবেই তাদের স্বভাব নষ্টের দিকে ধাবিত করে দেয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হলো একটি গোপন অপরাধ কর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা। এর আওতায় যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ রোধ এবং উৎস থেকে মূলোৎপাটন করা সম্ভব।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, অপরাধীরা সম্ভ্রান্তদের মাঝে আত্মগোপন করে থাকে। নষ্টা নারীরা বিভিন্ন রুচিশীল পোশাক পরে নানা স্টাইলে পরিবেশিত হয়। রাতে অন্ধকারে অসৎ উদ্দেশ্যে গাড়িতে করে নির্জন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। তাদেরকে জৈবিক চাহিদা পূরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় সতী-সাধ্বী নারীর বেশও ধারণ করে তারা। দেখলে মনে হবে, বড় কোনো সরকারি কর্মকর্তা কিংবা অভিজাত শ্রেণির অথবা কোনো ধার্মিক যুবতি! অথচ এই পোশাকের আড়ালে সে একজন পেশাজীবী দেহ ব্যবসায়ী বৈ কিছু নয়।

এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে করণীয় হলো এ সমস্ত গোপন দুরাচারীদের উচ্ছেদ করা। এখানে কোনো ধরনের শৈথিল্য এবং কারও সুপারিশ বা অনুরোধ গ্রহণ করা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

এই তিনটি প্রক্রিয়ায় রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পার।

রোগ প্রতিরোধের দ্বিতীয় ধাপ : যৌনরোগ প্রতিরোধের দ্বিতীয় ধাপ হলো অপরাধ পুনরাবৃত্তি প্রতিহতকরণ। এই ধাপটি বাস্তবায়ন করতে হলে নষ্টা নারী ও অপরাধকর্মে সহায়তাকারীদের আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র প্রসঙ্গটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীর সব দেশেই চলচ্চিত্রের অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়; তবে তা হয়ে থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাদের অনুমতিক্রমে। ছোট-বড় এবং যুবক-বৃদ্ধ সবার জন্যে আলাদা-আলাদা প্রোগ্রাম পরিবেশন করা হয়। কিন্তু আমরা ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধের মাঝে কোনো তফাৎ রাখি না। একই অনুষ্ঠান সবার জন্যে প্রচার করা হয়। যে কারণে আমাদের নৈতিক উন্নতি ও পৌরুষ বিকাশের পথে রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন হলো, আমরা কেন ফিরিঙ্গি জাতির ভালো দিকগুলো অনুকরণ না করে কেবল মন্দ দিকগুলোর অনুসরণ করে যাই?

মূলত এই সিনেমাই হলো সমস্ত অনিষ্টের মূল এবং ফেতনার উৎস।

দ্বিতীয়ত. এই ধাপেরই আরেক উপ-ধাপ হলো নগ্ন উপন্যাস এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ম্যাগাজিনে নারীদের অশোভন চিত্র ও চরিত্র প্রকাশ হওয়া।

এ ব্যাপারে কোনো পর্যবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। সরকারি-বেসরকারি আলেম-ওলামা কেউই এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ জানায় না। অথচ যারা ধর্মীয় চিন্তাবিদ, উচ্চপদস্থ লেখক এবং শিক্ষা-অধ্যাপনায় নিয়োজিত, তাদের তো অবশ্যই এ সমস্ত অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল।

এ নোংরা উপন্যাসগুলো যুবক-যুবতির চরিত্রে পচন ধরিয়েছে। তাদের দেহে অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস পাচার করেছে। এগুলো তাদের মাঝে দীনি বোধশক্তি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

ইদানীং পত্রিকার সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদকরা ম্যাগাজিনগুলোতে নগ্ন ছবি ফলাও করে ছাপিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, কোন পত্রিকা বেশি

খোলামেলা নগ্নছবি প্রকাশ করতে পারে, তা নিয়ে দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এসবের অপথাবায় জাতির যে অধঃপতন হয়েছে, ইতোপূর্বে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও তা সম্ভবপর হয়নি। কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদও দেশ ও জাতিকে এতটা ক্ষতি করতে পারেনি।

রোগ প্রতিরোধের তৃতীয় ধাপ : সামাজিক অবক্ষয় রোধ ও যৌন মহামারি রোধ করার তৃতীয় ধাপ বোঝার আগে কিছু বিষয়ের অবতারণা করা অপরিহার্য মনে করছি। তাহলো, সড়কে, পথেঘাটে উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ নারীর ছবি দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। তাছাড়া অশালীনভাবে পর্দা ছাড়া নারীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তাদের হাঁটু, হাতের বাহু, বুক-পিঠ, নিতম্বের দিক প্রায় খোলাই থাকে। অথচ ধর্মীয় রীতিনীতি, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং উন্নত সভ্যতা এসব পোশাক কোনোভাবেই সমর্থন করে না। পরিতাপের বিষয় হলো, তা সত্ত্বেও এসব নোংরা পোশাককেই আমাদের আধুনিক দাবিদাররা প্রগতির ধারক মনে করে থাকে।

আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়া মহামারি আকার ধারণ করে চলেছে। নগ্ন অপরাধ এমনভাবে সমাজদেহের সাথে মিশে গেছে যে, এখন এগুলোকে কেউ অপরাধ মনে করে না। দিন দিন এর প্রচারকার্য এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে, এখন দেশের মিডিয়াগুলোর অর্থনৈতিক আয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব নোংরা চিত্র আর নোংরা ছবির প্রদর্শন।

অবস্থার বাস্তবতায় এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, নগ্ন অপরাধের বিরুদ্ধে আমরা যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাজার কর্মী সংগ্রহ করি কিংবা আমরা যদি অন্যায় প্রতিরোধে সর্বোচ্চ শাস্তিবিধানও প্রণয়ন করি; তথাপি আশানুরূপ ফল লাভ করা সম্ভব হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নষ্টা নারী ও নগ্ন প্রচার রোধ করা না হবে ততক্ষণ কপাল থাপড়ালেও কোনো লাভের মুখ দেখার আশা করা উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতোই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমাদের কর্মসূচি হলো– একদিকে ঘর পরিষ্কার করব, অপরদিকে ছাদের ছিদ্র দিয়ে বালু পড়তে থাকবে। আমাদের আরো দুঃখজনক অবস্থা হলো, কেউ রোগাক্রান্ত হলে সেবা-সহযোগিতায় এগিয়ে আসব বটে; কিন্তু ভিন্ন দিকে রোগের আগমনপথও সুরক্ষিত রাখতে কসুর করব না!

তাই আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, এই রোগের প্রতিরোধ এবং মূল থেকে উৎপাটনের একটাই মাত্র পথ রয়েছে। তা হচ্ছে যুবক-যুবতির বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন।

রোগ নিরাময়ের স্থায়ী ব্যবস্থা

এ পর্যন্ত যে সমস্ত সমাধানের কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলো হলো সাময়িক এবং তাৎক্ষণিক উপশমের প্রাথমিক ব্যবস্থা। একে ওয়ান টাইম ট্রিটমেন্টও বলতে পারেন। কিন্তু এবার যেই প্রতিষেধক নিয়ে কথা বলব তা হলো বাস্তবভিত্তিক এবং স্থায়ী।

আমার কথায় হয়তো কেউ কেউ হাসতে পারেন যে, আরে! কিছুক্ষণ আগে আপনি নিজেই তো বিবাহের জটিলতার কথা বলে এলেন। এখন একে আবার সমাধান হিসেবে পেশ করছেন কিভাবে? ব্যাপারটি কি পরস্পর বিরোধী হলো না?

আপনাদের হাসি উদ্রেক হওয়া সেই মনের খুদুরবুদুরের জবাবে আমার উক্তি হলো, আমি এ মুহূর্তে একজন চিকিৎসক। আমার কাজ হচ্ছে রোগ নির্ণয় করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়া।

ধরুন, রোগ হলো ম্যালোরিয়া এবং এর প্রতিষেধক হলো কুইনাইন। এখন যদি ফার্মেসির লোকেরা কুইনাইন লুকিয়ে রাখে বা দাম বাড়িয়ে দেয় কিংবা তাদের ফার্মেসি বন্ধ করে রাখে, তাহলে ডাক্তারের দোষ কোথায়?

হ্যাঁ, ফার্মাসিস্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে পারে। এটা কেবল একটা উদাহরণ। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ফার্মেসি বা প্রশাসনের নাম মেনশন করে আমি কথা বলছি না।

আমার সাথে আপনারা অবশ্যই ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো বৈবাহিক সমস্যা নিরসনকল্পে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা। তাদের কাজ হবে বিয়ের সহজায়নের পথ নির্ণয় করা। কমিটি গঠনের নির্দেশনামূলক একটা প্রবন্ধ অবশ্য আমি লিখেছিলাম। শরিয়তসম্মত বিধিও প্রণয়ন করেছিলাম। হয়তো কাগজের পাতায় এখনও বেঁচে আছে এবং থাকবে।

রাষ্ট্র কর্তৃক কমিটি গঠন বিষয়ক প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, মানুষকে বৈবাহিক জীবনের প্রতি উৎসাহদান, সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার রোধ, অনুষ্ঠান-আয়োজন ও দেনমোহর সাধ্যের ভেতরে নির্ধারণ, ষষ্ঠ শ্রেণি ও

তদুপরি কর্মচারীদের বিবাহ বাধ্যতামূলক করা, সামর্থ্য থাকার পরও যারা বিয়েতে অনাগ্রহী, তাদের ওপর করারোপের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থায় স্থিতি ফিরিয়ে আনা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের নারীশিক্ষার উপযোগী শিক্ষাধারা চালু করা ইত্যাদি। আশা করি, সরকারিভাবে এসব উদ্যোগ নেয়া হলে যৌন অপরাধ তো কমবেই, সময়ের ব্যবধানে অন্য অপরাধও শূন্যের কোটায় চলে আসবে।

আমি মনে করি, এ বিষয়ে প্রতিটি সেক্টরে নিয়োজিতদের কলম ধরা উচিৎ। যেমন- ফতোয়া বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনী, অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বিভাগ, পরামর্শ বিভাগ, বিচার বিভাগ, লেখক ফোরাম, কবি-সাহিত্যিক সংগঠন এবং আঞ্চলিক ও এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কমিটি এতে অংশগ্রহণ করে তাদের কর্ম নির্ধারণ করতে পারে।

সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়রোধে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বলেছি, তা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। বিষয়গুলো নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি। এ সমস্যা সমাধানে আমি অনেক গবেষণাও করেছি। শুধু গবেষণা করেই ক্ষান্ত হইনি। আমি বিষয়গুলো নিয়ে বহু চিন্তাবিদ ও গবেষকের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তারা সবাই আমার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন। আর এ কারণেই আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আমার প্রেসক্রিপশন সবই ভুল হবে কিংবা সবই বৃথা যাবে– এমন হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত নির্দেশনা হলো বিবাহের পথ সহজ করা। এ ব্যাপারটি যত সহজ করা যাবে, ততই সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গঠন সহজ হবে।

একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তাহলো, আপনি হয়তো কাউকে দেখলেন যে, সে খুব ক্ষুধার্ত। আপনার চোখের সামনেই লোকটি ক্ষুধার জ্বালায় কাতরতা দেখাচ্ছে। তার এই অবস্থা দেখে আপনার মনে দয়ার উদ্রেক হলো। আপনি এও দেখলেন যে, লোকটির সামনেই রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন আইটেমের খাবার সাজানো আছে। কিন্তু তার সেগুলো কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। এখন আপনি কী করবেন?

আপনি তো আর সেখান থেকে কোনো খাবার চুরি করে নিবেন না! তাহলে আপনাকে কী করতে হবে? হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে অবশ্যই কোনো বিনিময় দিতে হবে এবং খাবার কিনে ক্ষুধার্তকে খাওয়াতে হবে। আপনি যদি তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা না করে শুধু ওয়াজ-নসিহত করেন, তাহলে কি কোনো ফায়েদা হবে? না! নিশ্চয় হবে না।

মনে রাখবেন নিশ্চয় বিশ্বজাহানের অধিপতি মহান স্রষ্টা যেখানেই কোনো দরজার কোনো পার্ট বন্ধ করেছেন, সেখানেই তিনি সাথে সাথে আরেকটি পার্ট মেলে ধরেছেন। তিনি যা কিছুই হারাম করেছেন, তার বিপরীতে অন্য একটি জিনিস হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা সুদ-জুয়া অবৈধ বলেছেন; পক্ষান্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈধ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি যেনা নিষিদ্ধ করেছেন পক্ষান্তরে বিয়ের পথ খুলে রেখেছেন। এখন সমাজ যদি হালাল ও বৈধ পন্থার সাথে বয়টক করে, তাহলে যুবক-যুবতিরা হারাম পথে সন্ধির হাত না বাড়িয়ে কী করবে?

রোগ প্রতিরোধের চতুর্থ ধাপ : সমাজবিধ্বংসী যৌনরোগ প্রতিরোধের চতুর্থ ধাপ হলো দেহাবয়বে শক্তি সঞ্চার এবং রোগের পুনরাবৃত্তির পথে বাঁধ নির্মাণ করা। এর জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য। তাহলো, আল্লাহর ভয়, উত্তম নৈতিকতা এবং উন্নত মানবিক ধারা অনুশীলন।

এই অপরিহার্য তিনটি বিষয় রপ্ত করার জন্য নিয়মিত কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। বরং এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিক্ষা তথা দীনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। মনে রাখতে হবে যে, যার মাঝে থাকবে দীনের প্রতি পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস, যার হৃদয়ের অণুগুলো আল্লাহর স্মরণে থাকবে প্রকম্পিত এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে যে হবে অকুতোভয় তিনিই হন আদর্শ শিক্ষক। কারণ, যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করেন কিন্তু নিজেই এর বরখেলাফ করেন অথবা কথা আর কাজে কোনো সমতা রাখেন না কিংবা তিনি মানুষকে আখেরাতের প্রতি আহ্বান জানান বটে অথচ তিনি নিজেই দুনিয়ামুখী, তাহলে এমন শিক্ষকই হলেন মন্দের উৎসভূমি।

গায়ে হলুদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

প্রশ্ন : আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আমার কন্যাকে বিবাহ দিব। এজন্য আমি মনস্থ করেছি– ব্যাপক আলোকসজ্জা, সাময়িক পানির ঝরনা ও আলিশান গেট করে বিয়ে বাড়ি সজ্জিত করব। তাছাড়া আমার কন্যার মন প্রফুল্ল রাখার জন্য যদি শুধু মেয়েরা মিলে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করে তাহলে এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কিনা? তাছাড়া আমি খুশি হয়ে যদি বিবাহের দিন একশত লোককে দাওয়াত করি, তাহলে এই খাবার তাদের জন্য জায়েয হবে কিনা? বিবাহের একদিন অথবা কয়েকদিন পর যদি দুলহাসহ প্রায় পঞ্চাশজন লোক খাওয়ার জন্য আসে এবং আসার সময়

তারা সবজি, গোশত, মাছ ইত্যাদি অনেক জিনিস আনে; এসব খাবারকে আমাদের এলাকায় ফিরানি খানা বলে। এটা জায়েয হবে কিনা? দলিল-প্রমাণসহ সমাধান দিয়ে অবগত করাবেন।

জবাব : আমাদের সমাজে বিবাহ-শাদিতে যে গেট দেয়া, নানাভাবে সজ্জিত ও আলোকসজ্জা করা হয় তা নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে নিষেধ–

১. গেট ও আলোকসজ্জা বিবাহের প্রয়োজন বহির্ভূত। তাই অপ্রয়োজনীয় কাজে টাকা-পয়সা খরচ করাকে শরিয়তের পরিভাষায় ইসরাফ তথা অপচয় বলা হয়। অপচয় সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে অবতীর্ণ হয়েছে– তোমরা অপব্যয় কর না। তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। *[সূরা আরাফ : ৩১]*

কুরআন মাজিদে আরো ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অভিশপ্ত, অকৃতজ্ঞ। *[সূরা বনি ইসরাঈল : ২৭]*

২. গেট দেয়া ও আলোকসজ্জা নিজের অহংকার প্রকাশ এবং লোক দেখানোর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, বিবাহসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গৌরবময় ও লোক দেখানো কাজ পরিহার করা।

৩. বিবাহ-শাদিতে গেট ও আলোকসজ্জা করার রীতি-নীতি বিজাতীয় কালচার। তাই তা মুসলামানেদের পরিহার করা উচিত। কেননা হাদিসে ইরশাদ হয়েছে– যে যেই সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে সে তাদের মধ্য থেকে গণ্য হবে। *[আবু দাউদ : হাদিস নং ৪০৩১]*

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজ থেকে। সাধারণত গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে বরের ভাবী, বোন ও অন্যান্য আত্মীয় এবং তার বান্ধবীরা হলুদ রঙের জামা, কাপড় ও শাড়ি পরে অপরূপা সেজে কনের পিত্রালয়ে গিয়ে থাকে। সেখানে তাকে প্রথা অনুযায়ী হলুদের পানি দ্বারা গোসল দিয়ে আবার সকলে প্রস্থান করে। তাদের সাথে 'গায়ে হলুদ' লেখা একটি কুলাও শোভা পেতে দেখা যায়। এমনকি এলাকাভেদে আরো নানা প্রথার প্রচলনও দেখা যায়। এসব কর্মকাণ্ডের অনুমোদন কোরআন হাদিসের কোথাও নেই। বরং এগুলো হিন্দুদের আবিষ্কৃত কিছু কুসংস্কার। তাই মুসলমানদের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা আদৌ বৈধ নয়। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, যে যেই সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

আপনি যে বিবাহের দিন বরপক্ষের একশ জনের খাওয়ার আয়োজন করতে চান এটিও আমাদের সমাজে বিবাহে প্রচলিত হিন্দুয়ানি কুসংস্কারের একটি। একে সমাজের পরিভাষায় বরযাত্রী ভোজন বলা হয়। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) ও উত্তম তিন সোনালি যুগের কোথাও বিবাহের দিন বরযাত্রীদের খাওয়া দাওয়া (বৈরাত) অর্থাৎ কনের বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার কোনো নাম-চিহ্নও পাওয়া যায় না। এজন্য বরযাত্রী ভোজনের আয়োজন করা যাবে না। কেউ যদি খুশিমনে করে, তখনও এ খাবার আয়োজন বিবাহের দিন করা সমীচীন নয়। কারণ এটি বিজাতীয়দের প্রচলিত একটি প্রথা।

অতএব, আপনি নিজের খুশিতে বরপক্ষের একশজন বা কম-বেশ মানুষের খাবারের আয়োজন করতে চাইলে উক্ত কুসংস্কার থেকে বাঁচার জন্য এ আয়োজন বিয়ের দিন না করে বিয়ে অনুষ্ঠানের তিন চারদিন পর করতে পারেন।

আর বরপক্ষ আসার সময় যে সবজি, গোশত ও মাছ ইত্যাদি নিয়ে আসে, যাকে আপনাদের এলাকায় ফিরানি খানা বলে; এটিও একটি কুসংস্কার। এ কুসংস্কার সব জায়গাতে আছে। একেক জেলায় এ কুসংস্কারের নাম ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে।

যাহোক, আপনি এ কুসংস্কার থেকে বাঁচার জন্য বরপক্ষকে আগেই বলে দিতে পারেন যে, ফিরানি খানা বিজাতীয়দের প্রচলিত একটি ক্ষতিকর প্রথা। তাই আমি আশা করি যে, আপনারা এ ধরনের কোনো খানা আমার বাড়িতে আনবেন না।

উল্লেখ্য যে, বিবাহের দিন বরপক্ষ হতে কনে উঠিয়ে নেয়ার জন্য বরসহ তার সঙ্গে তার পিতা, দাদা, চাচা, ভাইবোন ইত্যাদি যে পাঁচ-দশজন স্বাভাবিকভাবে এসে থাকেন, তাদের মেহমানদারি প্রথার অন্তর্ভুক্ত হবে না।
[আবু দাউদ : হাদিস নং ৪০৩১, মিশকাতুল মাসাবীহ : ২৫৫, সুনানুন নাসায়ী : হাদিস নং ৫০২৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ১৭/৪০৬, ৩৯৪, ৪৬২]

সূত্র : মাসিক মঈনুল ইসলাম : মে ২০১৬।

যৌবনের মৌবনে

প্রতিটি যুবক ও যুবতি তাদের যৌবনের নিরাপত্তা চায়। তারা তাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে চায়। এই সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখি জীবন মানব জীবনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু এ প্রশান্তি কোন পথে রয়েছে তা

আমরা অনেকে তালাশ করে পাই না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিবাহের মধ্য দিয়ে মানবমনে যেই প্রশান্তি ও প্রফুল্ল আসে অন্য কোনোভাবে তা পাওয়া যায় না।

আমেরিকান ডাক্তারদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বর্তমান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কুমারদের তুলনায় বিবাহিতরা অধিক সুস্থ থাকে।

গবেষণায় আরো জানা গেছে যে, বিবাহিত লোকদের নেশার প্রতি আগ্রহ খুব কম থাকে। তারা নিজেদের খাদ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। এক সঙ্গী সকল ব্যাপারেই অপর সঙ্গীকে সহায়তা দেয়। তারা নিয়মিত ব্যায়াম করে।

এ ব্যাপারে মার্কিন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ উনিশ হাজার লোকের ওপর জরিপ চালানোর পর দেখা গেছে যে, অ্যাজমা থেকে মাথা ব্যথা পর্যন্ত প্রায় সকল রোগে কুমারদের তুলনায় বিবাহিতরা কম আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বৃটিশ ম্যারেজ প্লাস ওয়ান ইউরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাপক গবেষণা করার পর এ সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, বিবাহিত লোকেরা দীর্ঘ জীবনলাভ করে। তাদের স্বাস্থ্যও সুস্থ থাকে। তাদের ওপর মানসিক এবং শারীরিক রোগ খুব কম প্রভাব ফেলতে পারে। তারা দুর্দশাগ্রস্ত থাকে খুবই কম, আর্থিক দিক থেকে তারা থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে যারা কুমার জীবনযাপন করে অথবা বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয় তাদের ব্যাপারটি এদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এ বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকায় চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দাম্পত্য জীবনের পরাজয় অনেক মানসিক ও শারীরিক রোগের জন্ম দেয়। এ প্রসঙ্গে ফায়না এম সি আলাস্টারের বক্তব্য এই যে, শুধু ব্রিটেনেই প্রতি বছর ৩ লাখ ৪৬ হাজার প্রাপ্ত বয়স্ক তালাকপ্রাপ্ত হয় এবং প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু অবৈধ সম্পর্কের কারণে জন্মগ্রহণ করে। দাম্পত্য সম্পর্কের ঘাটতির কারণে বাস্তবজীবনে এরা সফলতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, বিবাহের দ্বারা নিম্নোক্ত উপকারিতা পাওয়া যায়–

১. আনন্দঘন দাম্পত্য জীবন দৈনন্দিন পেরেশানি এবং দুশ্চিন্তার মাঝে ঢালের মতো ভূমিকা রাখে।

২. বিবাহিত লোকদের স্বাস্থ্য স্বাভাবিকভাবে অবিবাহিত লোকদের চেয়ে বেশি সুস্থ থাকে।

৩. বিবাহ মানুষকে অনেক খারাপ কাজ যেমন- মদপান, অবৈধ সম্পর্ক এবং সিগারেট পান থেকেও রক্ষা করে।

ব্রিটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী এম সি আলাস্টার বলেন, দাম্পত্যজীবনে পরাজয় শারীরিক রোগ ছাড়াও অনেক মানসিক রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

অনুসন্ধান রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে ব্রিটেনের মানসিক রোগ হাসপাতালে প্রায় এক লক্ষ লোকের মধ্যে ২৫৭ জন বিবাহিত লোক চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিল। অথচ তার বিপরীতে ৬৬৫ জন অবিবাহিত, ৭৫২ জন বিপত্নীক এবং ১৫৯৬ জন তালাকপ্রাপ্ত লোক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছে। আর নারীদের মধ্যে ৪৩৩ জন বিবাহিতা, ৬২৩ জন অবিবাহিতা, ৬২০ জন বিধবা এবং ১৫৯৬ জন তালাকপ্রাপ্তা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছে।

অনুসন্ধানে এও দেখা গেছে যে, অবিবাহিতদের মধ্যে হার্টের রোগের কারণে মৃত্যুহার বিবাহিতদের চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া অবিবাহিত লোকেরা ক্যান্সার, আত্মহত্যা এবং আরো অন্যান্য প্রাণঘাতী রোগে বিবাহিত লোকদের তুলনায় অধিক আক্রান্ত হয়ে থাকে।

স্বামীর কোলেই নারীর প্রকৃত প্রশান্তি

নারী যত উচ্চ মর্যাদাই অর্জন করুক না কেন! শিক্ষা ও জ্ঞানে যতই অগ্রগতি লাভ করুক এবং ধন-সম্পদ ও সুখ্যাতি যতই আয়ত্ত করুক– এতে তাদের প্রকৃত প্রত্যাশা পূরণ হবে না। তাদের মান-মর্যাদা, প্রসিদ্ধি, সুখ্যাতি, ধন-সম্পদ তাদের মনকে শান্ত করবে না; বরং বিবাহ ও স্বামীর সান্নিধ্যই কেবল দিতে পারে তাদেরকে অনাবিল শান্তি ও সুখ। এর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে তাদের প্রত্যাশার ডালি।

নারীরা তাদের জীবনে তখনই প্রকৃত শান্তি খুঁজে পায় যখন সে একজন সৎ ও আদর্শ স্ত্রী হতে পারে, সম্মানিত একজন মা হতে পারে এবং একটি বাড়ির পরিচালিকা হতে পারে। এক্ষেত্রে একজন সাধারণ নারী থেকে শুরু করে রানি, রাজকন্যা, অভিনেত্রী, বিশ্বসুন্দরীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা।

এ প্রসঙ্গে আমি নাম উল্লেখ না করে দু'জন নারীর উদাহরণ দিতে চাই। আমি তাদেরকে খুব ভালো করে চিনি ও জানি। তারা উচ্চশিক্ষিতা, ধনবতী ও সুসাহিত্যিক। স্বামীহারা হয়ে তারা প্রায় পাগল অবস্থায় বেঁচে

আছেন। কয়েকদিন আগেও তাদের জীবন ছিল স্বাভাবিক। তাদের মুখে ছিল হাসি। আনন্দের সাম্পানে চড়ে খলখল করছিল তাদের জীবন। তাদের জীবন ছিল সুখে ভরপুর। এখন তাদের সবই আছে ভরা বেলুনের মতো। শুধু তাদের স্বামী নেই। এই একটি জিনিসের অভাবেই তাদের জীবন পানসা হয়ে আছে। তারা যেন বেঁচে থেকেও মৃতপ্রায়। এতে তাদের ভরা বেলুন চুপসে গেছে।

মূলত বিবাহ হচ্ছে প্রতিটি নারীর সর্বোচ্চ কামনা। এটিই তাদের মনের বাসনা। এটি দিয়েই মহান প্রভু তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সে যদি পার্লামেন্টের সদস্যও হয়ে যায় কিংবা কোনো রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টও হয়ে যায় তথাপি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনের প্রকৃত বাসনা পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না বউ হয়ে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে।

তাই স্বামীর কোলেই নারীর প্রকৃত প্রশান্তি নিহিত। একবার যদি কোনো মেয়ের জীবনে কলঙ্ক নেমে আসে এবং তার সমাজ যদি তা জেনে ফেলে; তবে কেউ তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে না। এমনকি যেই পুরুষ তাকে নষ্ট করেছে সেও তাকে বিয়ে করে নিজের সংসার গড়তে রাজি হবে না। অথচ সে বিয়ের মিথ্যা ওয়াদা করে তার সতীত্ব ও সম্ভ্রম নষ্ট করেছে আর মনের চাহিদা পূরণ করে কেটে পড়েছে। উল্টো সে যখন বিয়ের মাধ্যমে কোনো নারীকে ঘরে তুলতে চাইবে তখন তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, ভদ্র, সতী ও পবিত্র নারীকেই খুঁজবে।

একজন পুরুষ কখনই চাইবে না যে, তার স্ত্রী হোক একজন নষ্ট নারী। কোনোক্রমেই সে মেনে নিতে চাইবে না যে, নিজ ঘরের পরিচালিকা হোক একজন নিকৃষ্ট মহিলা। কোনো পুরুষই মেনে নিতে চায় না যে, তার সন্তানের মা হোক একজন ব্যভিচারিণী।

পুরুষরা নিজে ফাসেক ও পাপী হয়েও চাইবে তার স্ত্রীটি হোক ফুলের মতো পবিত্র। এমনকি যখন সে নিজের পাপ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য পাপের বাজারে কোনো পাপিষ্ঠা নারীকে খুঁজে পাবে না এবং বিয়ে ছাড়া নিজের যৌনচাহিদা পূর্ণ করার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না তখন সে ইসলামের সুন্নাত অনুযায়ী বিয়ের মাধ্যমে কাউকে নিজের স্ত্রী বানানোর সন্ধানে বের হবে। সে কোনো পতিতাকে বা নষ্ট মহিলাকে কখনোই ঘরের স্ত্রী বানাতে রাজি হবে না।

যুবকের রঙিন চশমায় নারীর অবয়ব

সতেরো বছর বয়সে যে জিনিসটি কোনো যুবককে ঘুমুতে দেয় না, এই জিনিসটি ছোট বড় আরও অনেককেই ঘুমুতে দেয় না। এমনকি এ কামনার আগুন অনেকের আরামের ঘুম হারাম করে। অনেক ছাত্রকে অমনোযোগী করে পাঠে। অনেক শ্রমিক কাজ হারায়। অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসা লাটে ওঠে।

যে প্রেমের বর্ণনা কবিরা দিয়েছে, সাহিত্যিকরা কল্পনার রং মেখে যা উপস্থাপন করেছে, তা-ই প্রত্যেকের মাঝে বিরাজ করে। দুটো একই। পার্থক্য হলো, কেউ এ প্রেমকে গ্রহণ করে খোলামেলা নিরাভরণ। কথিত বুদ্ধিমানরা তা ঠিকই ধরতে পেরেছে। তাই তারা মানুষকে প্রতারিত করার জন্য বিষয়টিকে চকোলেটের মতো কাগজে মুড়িয়ে পরিবেশন করে। কেউ পান করে ঝরনায় মুখ দিয়ে, আর কেউ পান করে কারুকার্যমণ্ডিত সুন্দর গ্লাস দিয়ে।

যৌবনের চাহিদা মূলত কবিদের কবিতা, গজলের পঙ্‌ক্তি, ফটোগ্রাফারের ফটো, চিত্রশিল্পীর আলপনা আর গায়কের সুরের মতো। এখানে কামনা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ওখানে প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট। মজার ব্যাপার হলো, সবচেয়ে মন্দ ব্যাধি হলো যা প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট। মানুষের সামনে যা রঙিন ফানুসের মতো তুলে ধরে অথচ এর ভিতরটায় থাকে গরল। যাকে 'কথা সত্য মতলব খারাপ' বলা যেতে পারে।

যুবক বয়সে এসে সবারই ভেতরে নিভে থাকা একটি জিনিস জ্বলে ওঠে। এ বয়সীরা এর উত্তাপ অনুভব করে হাড়ে হাড়ে। পৃথিবী হয়ে ওঠে তাদের কাছে অন্য পৃথিবী। মানুষ হয়ে যায় তাদের চোখে অন্য কিছু। তাদের চোখে একজন নারীকে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ মনে হয় না; হয় অপরূপা হুর।

একজন মানুষের যা বৈশিষ্ট্য থাকে প্রতিটি নারীর মাঝেও তা বিদ্যমান। একজন মানুষের যা দোষ আছে তা-ও আছে তার মাঝে। কিন্তু যুবকেরা সে নারীর মধ্যে দেখতে পায় এক ধরনের আশা। সে দেখতে পায় তার জীবনের সব আশাই যেন ঐ যুবতির মাঝে এসে ভিড় করেছে। তার মাঝেই যেন শাদা বলাকার মতো এসে উড়াউড়ি করছে সব স্বপ্নের চাওয়া পাওয়া। তার মাঝেই বাস্তব হয়ে দেখা দেয় মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা আশাগুলো।

হ্যাঁ, যুবক যদি তার প্রত্যাশিত যুবতিকে শরিয়ত মোতাবেক বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তাহলে একবার তাকে দেখা বৈধ। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.

তোমাদের কেউ কোনো নারীর প্রতি বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর তাকে দেখলে কোনো গুনাহ হবে না। *[মুসনাদে আহমাদ]*

একজন যুবক নারীর মাঝে দেখতে পায় এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা। যেখানে এসে মিলিত হয়েছে সব চাওয়া পাওয়া। তার সহজাত কল্পনায় নারীকে পরিয়ে দেয় এমন পোশাক, যা তার সব দোষ ঢেকে দেয়, দুর্বলতা আড়াল করে দেয়। সে তখন তাকে উন্মুক্ত করে সৌন্দর্য আর কল্যাণের প্রতিমারূপে।

প্রতিটি যুবক একজন নারীকে নিয়ে তা-ই করে, যা করে একজন কৃতার্থ পূজারী পাষাণ প্রতিমা নিয়ে। সে নিজ হাতে প্রতিমা গড়ে তারপর প্রভু ভেবে পূজা করে। মূর্তিপূজারীর কাছে পাথরের প্রভু আর প্রেমিকদের কাছে রমণী কল্পনার মূর্তি।

এসবই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক। কিন্তু যে জিনিসটা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক তাহলো পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটি যুবককে কামনার এহেন তীব্র দহনে দগ্ধ হওয়ার পরও শিক্ষাব্যস্থার অযৌক্তিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিশ-পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত এভাবেই কামনার তীব্র দহনে দগ্ধ হতে হয়। এই বছরগুলোতে যৌবনে ভরপুর তরুণ বা তরুণী কী করবে? একজন যুবক যেমন তার কল্পনার যুবতি প্রতিমাকে নানা রঙে সাজায় তেমনি একজন তরুণীও তার কল্পনার পাখায় ভর করে উড়াউড়ি করে একজন স্মার্ট যুবকের সন্ধানে। সেও তার স্বপ্নের রাজকুমারের প্রতিমায় মনের মাধুরী মিশিয়ে আল্পনার প্রলেপ আঁটে। যুবক-যুবতিদের বিশ-পঁচিশ বছরগুলোই কামনা বাসনা আর দৈহিক অস্থিরতার চূড়ান্ত সময়।

হীরা মানিক পান্না

প্রত্যেক নারীর কাছে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ হীরা, মানিক কিংবা পান্নার চেয়েও দামি। সেই বড় সম্পদ হলো তার সতীত্ব। এ সম্পদ হারালে তামাম দুনিয়ার বিনিময়েও তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানুষরূপী জানোয়ারদের কবলে পড়ে কোনো নারী যদি তার অমূল্য সম্পদ হারায়, তার মর্যাদা নষ্ট হয় এবং সম্ভ্রম ও সতীত্ব চলে যায়, তাহলে তার হারানো সম্মান দুনিয়ার কেউ পুনরায় ফেরত দিতে পারবে না।

কোনো নারী যদি স্বীয় ইজ্জতহারা হয়ে সমাজ থেকে ছিটকে পড়ে কেউ তার হাত ধরবে না এবং তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে না।

যতদিন সেই নারীর শরীরে যৌবন অবশিষ্ট ছিল ততদিন পাপিষ্ঠরা তার সৌন্দর্যের চারপাশে ঘুরঘুর করেছে এবং তার প্রশংসা করেছে। যৌবন চলে যাওয়ার সাথে সাথেই কুকুর যেমন মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে হাড্ডিগুলো ফেলে রেখে চলে যায় ঠিক তেমনি তারা তাকে রেখে দূরে চলে যায়।

রক্তে-মাংসে গড়া যে কোনো যুবকের মনই কোনো টগবগে যুবতিকে কাছে পেতে চায়। আর এ কারণে সে যে কোনো যুবতির পিছে কুকুরের মতো ঘুরঘুর করতেও লজ্জাবোধ করে না। যে যুবতির চাহনি কিংবা চলাফেরা সুন্দর তার প্রতিই যুবকরা বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আর তরুণীরা যুবকের চাহনিতে মজে যায়। সে বেমালুম ভুলে যায় পুরুষের আসল কামুক চেহারা।

তাই আমি বলব, হে যুবতি! তুমি কি জান পুরুষেরা কেন তোমার কাছে আসতে চায়? সে কেন তোমাকে নিয়ে ভাবে? কারণ তুমি খুব সুন্দরী এবং যুবতি। সে তোমার সৌন্দর্যের পাগল। তাই সে তোমার চারপাশে ঘুরঘুর করে এবং তোমাকে নিয়েই ভাবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তোমার এই যৌবন ও সৌন্দর্য কি চিরকাল থাকবে? পৃথিবীতে কোনো জিনিস কি চিরস্থায়ী হয়েছে? শিশুর শিশুকাল কি শেষ হয় না? সুন্দরীর সৌন্দর্য কি আজীবন থাকে?

তোমার বোন যদি বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনে আত্মনিয়োগ না করে এবং ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে ইসলামি পারিবারিক জীবনের গণ্ডির বাইরে চলে যেতে চায় তাহলে তাকে প্রশ্ন কর যে, হে বোন! তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, যখন তোমার পিঠ ও কোমর বাঁকা হবে এবং দেহের সৌন্দর্য বিলীন হবে তখন কে তোমার দায়িত্ব নেবে? তোমার পরিচর্যাই বা করবে কে? তা কি তোমার জানা আছে? যারা তার সেবা করবে, তারা হচ্ছে তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি। আর সে রানির মতো সিংহাসনে বসে পরিবারের অন্যদেরকে পরিচালনা করবে। এখন তুমি চিন্তা কর তো, তুমি কী করবে? বিবাহের মাধ্যমে তুমি কি এক নির্মল শান্তির সংসার রচনা করবে, নাকি ব্যভিচারিণী হয়ে স্বল্প সময় উপভোগ করে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিবে? স্থায়ী সুখের বিনিময়ে অস্থায়ী সুখ ক্রয় করা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

তুমি যদি আঁচ করতে পার যে, পুরুষ হচ্ছে নেকড়ে আর তুমি হচ্ছ ভেড়া, তাহলে কিন্তু তুমি নেকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ভেড়ার ন্যায় পলায়ন করবে। তুমি যদি জানতে পার যে, সকল পুরুষই চোর তাহলে কৃপণের মতো তুমি তোমার সকল মূল্যবান সম্পদ পুরুষের কবল থেকে হেফাজত করার জন্য সিন্দুকে লুকিয়ে রাখবে।

মনে রেখ, নেকড়ে কিন্তু ভেড়ার গোশত ছাড়া অন্য কিছু চায় না। আর পুরুষ তোমার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নিতে চায় তা কিন্তু ভেড়ার গোশতের চেয়েও অনেক মূল্যবান। তা যদি তোমার কাছে থেকে চলে যায়, তাহলে জেনে রাখবে তা হারিয়ে তোমার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। সে তোমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি নষ্ট করতে চায়, তোমার সম্মানের বিষয়টি ছিনিয়ে নিতে চায় এবং তোমার অমূল্য রত্নটি অপহরণ করতে চায়।

জানতে চাও! সে অমূল্য সম্পদটি কী? কী সেই অমূল্য রতন ও হীরা? হ্যাঁ, সেটি হচ্ছে তোমার সতীত্ব ও পবিত্রতা। যাতে রয়েছে তোমার সম্মান। যা নিয়ে তুমি গর্বিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাও। আল্লাহর শপথ! পুরুষ তোমার এটিই নিয়ে নিতে চায়। এটি ছাড়া অন্য কথা কেউ বললে তুমি তা বিশ্বাস করো না। কোনোক্রমেই তার মধুর কথায় গলে যেও না।

বর্তমান সময়টাকে আমরা বড়ই জটিল স্থানে নিয়ে এসেছি। এখন কেউ কারো উপকার করতে এগিয়ে আসতে চায় না। তাই জেনে রেখ যে, তোমার হেফাজত তোমার হাতেই। হ্যাঁ, এ কথা সঠিক যে, পাপের পথে অগ্রসর হওয়াতে পুরুষকেই প্রথম দায়ী করা যায়। এর সাথে সাথে আমার অভিজ্ঞতা এ কথা অকপটে বলে দেয় যে, নারী কখনই প্রথমে এ পথে অগ্রসর হয় না। তবে তাদের সম্মতি ব্যতীত কখনই পুরুষও অগ্রসর হতে পারে না। নারী নরম না হলে পুরুষ শক্ত হয় না। নারী দরজা খুলে দেয় আর পুরুষ তাতে প্রবেশ করে। আর প্রবেশ করেই ডাকাতের মতো লুটে নেয় মূল্যবান হীরে মানিক মুতি পান্না!

সুস্থ বিবাহের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সুস্থ বিবাহ সম্বন্ধে জটিলতা সৃষ্টির বেশ কিছু কারণ রয়েছে। সামাজিক নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত আমাদের সমাজদেহ। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হলো—

১. তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থা :

বিবাহোত্তর নানা জটিলতার অন্যতম সামাজিক ব্যাধি হলো বর্তমান তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের আল্লাহপ্রদত্ত স্বভাবগুণ ও আত্মিক চাহিদা এবং বস্তু ও বাস্তবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ তায়ালা যুবক ও যুবতির মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তির উপকরণ রেখে দিয়েছেন। তিনি এই সুপ্ত শক্তির প্রকাশের জন্যে পনেরো ও এর কাছাকাছি বয়স নির্ধারণ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং মানুষের চাহিদা ও সেই চাহিদার সময় সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবহিত। সেই প্রেক্ষিতেই ইসলাম যুবক-যুবতির যৌনপ্রবৃত্তি প্রকাশের বয়স নির্ধারণ করেছে পনেরো-ষোলো বছর। যখন কোনো ছেলে অথবা মেয়ে এ বয়সে উপনীত হয়, তখন নিজের ভেতর এক অজানা তাড়না অনুভব করে। এতদিন যা ঘুমন্ত ও অচেতন ছিল, এ সময়ে তা জাগ্রত ও সচেতন হয়ে পড়ে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। *[সূরা নূর : ৩২]*

দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যুবক-যুবতিদের পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে থাকতে বাধ্য করে। একটি শিশু জাতিসংঘের নিয়ম মোতাবেক স্বভাবত সাত বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বারো বছর পড়াশোনা করে। তখন তার বয়স উনিশে পৌঁছে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে চার থেকে সাত বছর অধ্যয়ন করে। এ সময়ে তার বয়স হয় তেইশ থেকে ছাব্বিশ। পরে অনেকে ডিগ্রি অর্জনের জন্যে ইউরোপ-আমেরিকায় গমন করে। সেখানে আরও তিন-চার বছর সময় ব্যয় হয়। ফলে দেখা যায়, শিক্ষাজীবন পাড়ি দিতেই ত্রিশ বছর শেষ!

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই দশ-পনেরো বছর কিভাবে একজন তারুণ্য উদ্দীপ্ত যুবক-যুবতি সততার সঙ্গে কাটাতে পারে? যখন তার ভরা যৌবনে কামনা-বাসনার পূর্ণ জোয়ার, শিরা-উপশিরায় যখন তার প্রবৃত্তির তাড়না,

সেই সাথে তার ওঠাবসা-চলাফেরা আবেগপূর্ণ সহপাঠীদের সাথে! তার সাথে যদি পাশ্চাত্যে সফর করা যোগ হয়ে থাকে, তাহলে তো ভালোবাসার সাগরেই হাবুডুবু খেয়ে একাকার। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের কথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা আর ইসলামি নির্দেশের মাঝে ফারাক অনেক।

আমার এ আলোচনা প্রবৃত্তিবিষয়ক নয়। আমি জানাতে চাচ্ছি না, এই সময়ে তারা কী করে? বরং আমার আলোচ্য বিষয় হলো, বিবাহ কিভাবে বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য।

ত্রিশ বছরের আগে যুবক-যুবতিরা বাবার খেয়ে লালিত-পালিত হয়। এ সময়ে নিজের কায়-কারবার কিছুই নেই। একেবারেই হতদরিদ্র! এরপর যখন বিয়ের বয়স (?) হয়, তখন আয়-উপার্জন করতে আরও পাঁচ বছর চলে যায়। ফলে তখন কারো কারো বয়স এসে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশে।

মূলত এসব কল্যাণকর পথ হতে শয়তান মানুষকে বিরত রাখে। তাই নীতিবান মানুষের জন্য উচিত হলো এসব অন্যায় কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চল না, যার অন্তঃকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামি করতে শুরু করেছে এবং যার কার্যকলাপ সীমানা লঙ্ঘন করেছে সে (শয়তানের) পথেও চল না। *[সূরা কাহাফ : ২৮]*

ভালোভাবে হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, আমাদের সমাজে এ ধরনের যুবকের অভাব নেই। এক পর্যায়ে দেখা যায়, তারা আর বিয়ে-শাদি করে না। কারণ, তাদের কাছে ঐ সময়টাতে বিয়ে করা এক ধরনের ঝামেলা বলে মনে হয়। সেই সাথে প্রবৃত্তি-চাহিদাও অনেকাংশে কমে যায়। যৌবনেও ভাটা নামে ততদিনে।

এ কারণে আমার গবেষণা মতে, বৈবাহিক জটিলতার অন্যতম সামাজিক ব্যাধি হলো প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। গত কয়েক যুগ আগেও যখন বড় বড় এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল না, তখন সাধারণ যুবকশ্রেণি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বিশ বছরে পা রাখলে তাদের দু-একটা দোকান থাকত এবং তারা বেশ সম্পদের অধিকারী হয়ে যেত। একদিকে হতো খাঁটি ব্যবসায়ী, অন্যদিকে স্বামী, বাবা ও পরিবারের কর্তা। আর মেয়েদের চৌদ্দ বছর হলে বিয়ে-শাদি দেয়া হতো।

কিন্তু আজকের প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ চৌদ্দকে দ্বিগুণ করে আটাশ বছরেও দেখা যায় মেয়েদের বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর কোনো পেরেশানি অভিভাবকের মাঝে দেখা যায় না। এসবই আমাদের প্রচলিত আধুনিক (?) শিক্ষাব্যবস্থার ফসল।

২. বিয়ে-শাদিতে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক প্রথা :

বৈবাহিক জটিলতার আরেক সামাজিক ব্যাধি হলো আমাদের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথা। মূলত সমাজদেহে ঘাপটি মেরে বসে থাকা এই কুপ্রথাগুলো একসাথে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। এ প্রথা কারও জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

আমাদের সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নানা আয়োজন-অনুষ্ঠান করা হয় শুধু মানুষের সামনে নিজেকে বড় দেখানোর উদ্দেশ্যে। অনেক আয়োজন হয়ে থাকে অন্যায়-অপচয়ে গর্হিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের জন্যে। যেমন অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ, দামি-দামি উপহারসামগ্রী ও সজ্জা সরবরাহ করা।

বিভিন্ন কারণে আমাকে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। মোটামুটি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ আমার হয়েছে। বিশেষত কথিত উন্নত দেশ দাবিদার সবগুলো দেশই আমি ভ্রমণ করেছি। সে সময়গুলোতে আমি বহু বিলাসবহুল বাড়িতে গমন করেছি। অধিকাংশ বাড়িই পেয়েছি বিলাসসামগ্রীতে ভরপুর। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি নানা সামগ্রী। আমি আক্ষেপের সাথে এও দেখেছি যে, রুচি ও সৌন্দর্যের কোনো চর্চাই করা হয়নি সেগুলোতে। অথচ আমরা যাদের অনুকরণে এ সমস্ত বস্তুর আয়োজন করি, তারা আমাদের মতো অপচয়-অপব্যয়ে পয়সা খরচ করে না। যা প্রয়োজন তা-ই সংগ্রহে রাখে।

আমি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে, সেসব দেশের মানুষ বিনা প্রয়োজনে কিছু করেন না। কখনও সাজসজ্জার প্রয়োজন হলে মূল্যবান জিনিস দিয়ে ঘরবাড়ি সাজায়। রুচি ও চাহিদামতো সবকিছুর আয়োজন করে। স্মৃতি-স্মারক কিছু হয়তো উপহার দেয়। শুধু দামি আর মোটা হলেই হলো না। তাদের কাছে আপনারা অব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখতে পাবেন না। সারি সারি গ্লাস, চিনামাটির পাত্র, বোল-বাটি, সুগন্ধির কৌটা দিয়ে ঘর ঠাসা করা তাদের অভ্যাস নয়। তারা সব সময় ধাতুর চেয়ে রুচির মূল্য বেশি দিয়ে থাকে।

আমাদের দেশে বিবাহকে কেন্দ্র করে যেই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়ে থাকে বিদেশবৈভুবে এসবের কোনো বালাই নেই। যেমন আমাদের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিক আয়োজন– প্রথমে মেয়ে দেখা, তারপর আংটি পরানো, পোশাক পরানো, বিয়ে পরানো, বৌ-ভাত, সপ্তম দিন উদ্‌যাপন, পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান, প্রতিটি আয়োজনে অন্ততপক্ষে একশ প্রকারের বোঝা বহন করতে হয়। এসবের বালাই খুব একটা নেই তাদের কাছে। মূলত আমাদের দেশের প্রচলিত এসব অনুষ্ঠানে হৃদয়হীন কিছু মানুষের সমাগম করানো হয়। যাদের প্রকৃত অর্থেই না আছে কোনো ধরনের সহমর্মিতা, না আছে স্নেহ-মমতা। শুধু ভুঁড়িভোজই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

এ সমস্ত আয়োজন পাত্র-পাত্রী উভয়ের জন্যে একটা বোঝা। এগুলো একটা আপদ। এগুলো তাদের জীবনে সংকট সৃষ্টি করে দেয়। নীরবে কুড়ে খায় তাদের কলিজা। কী বিশ্রী কথা যে, ইদানীং বিভিন্ন জায়গায় আধুনিকতার নামে নারীদের থাকে কাপড়-প্রদান অনুষ্ঠান। বর-কনের হয় পোশাক বিনিময়। আবার পরস্পরের প্রদত্ত পোশাক নিয়ে চলে খুঁত বের করা। এসব বেলেল্লাপনা ও ভদ্রতা বর্জিত প্রথা ইসলামের নির্মল জমিনে নেই। এসবই আমাদের কথিত সামাজিকতা ও লৌকিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাছাড়া কথিত সভ্যতার আবরণে অন্যান্য নির্ধারিত 'হাদিয়া' ও 'উপঢৌকন'-এর নামে যৌতুকের লীলাখেলা তো আছেই। কখনও উভয় পক্ষের চুক্তিমতো নির্দিষ্ট মূল্যের উপহারকে বাধ্য করা হয়। প্রস্তাবকারী সাধারণ দেনমোহরের থেকে বেশির দায়িত্বও নিয়ে থাকে। কন্যার পিতাও মান রক্ষার্থে উপঢৌকনের মাত্রা বাড়াতে সম্মত হয়।

শুধু এখানেই শেষ নয়, সামাজিকতা ও লৌকিকতার শ্রাদ্ধ করতে সাথে সাথে যাদের দাওয়াত করা হয়, তাদের ওপরও সৃষ্টি হয় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ অঘোষিতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নতুন পোশাক এবং বর-কনের জন্যে 'হাদিয়া'র যোগান দিতে ভিন্ন পরিবারেও ব্যাপক কৃত্রিম চাপ সৃষ্টি হয়। যা অনেকের মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আমি এক সময় ইন্দোনেশিয়ার 'জাওয়া' দীপে ছিলাম। তখন সেখানকার অধিকাংশ যুবককেই বিবাহিত পেয়েছিলাম। তাদের সাথে বিবাহের রীতিনীতি সম্পর্কে কথা বলে জানতে পারলাম যে, তাদের দেশে এটা

একেবারেই সহজ ও স্বাভাবিক। আমি আমাদের দেশের বিবাহ-প্রথার কঠিনতা এবং আনুষ্ঠানিকতার বাধ্যবাধ্যকতার বিষয়টি তাদের জানালাম। আরো বললাম যে, এই পরিস্থিতির কারণে বৈধ পন্থায় বিয়ে করার চেয়ে অবৈধভাবে যৌনমিলন সহজসাধ্য হয়ে গেছে। একথা বলছিলাম আর মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলাম।

আমাদের অভিভাবকরা এই অশুভ দিকটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। একদিকে তারা সন্তানদের চরিত্রের ব্যাপারে তেমন যত্নশীল নন। অপরদিকে বিয়ের বিষয়টাও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। শুধু তাই না, আমাদের অভিভাবকরা বিয়েপ্রার্থীর সামনে নানা অজুহাতে ও ছলে-বলে শত কাঁটা ও বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রাখেন। এসবই আমাদের কথিত সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার। যা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে সন্তানদের সোনালি ভবিষ্যৎ অমানিশার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে।

৩. ধর্মীয় বিধান অমান্য করা :

বিবাহের পথে তৃতীয় সামাজিক ব্যাধি হলো, অধিকাংশ বিয়েতে ধর্মীয় বিধান মানা তো হয়ই না; উল্টো বর্জন করা হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিবাহের ধর্মীয় নিয়ম সম্পর্কেই অনেকে ওয়াকিবহাল নয়। তারা এর নিয়ম-পদ্ধতিই জানে না। স্বামী যেমন জানে না স্ত্রীর হক কী এবং নিজের দায়দায়িত্ব কী! ঠিক তেমনি স্ত্রীও বোঝে না স্বামীর হক কী এবং নিজের কর্তব্যই বা কী? ফলে কেউ কারও হক যথাযথভাবে আদায় করে না। একে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় মতবিরোধ ও মতানৈক্য। জন্ম নেয় ঝগড়া ও বাদানুবাদ। এভাবে দাম্পত্যজীবন হয়ে ওঠে বিষাদময়। মামলা, তালাক এবং পরিশেষে বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

৪. চারিত্রিক অধঃপতন :

বৈবাহিক জটিলতার চতুর্থ সামাজিক ব্যাধি হলো চারিত্রিক অধঃপতন ও নৈতিকতার অবনতি। এটা মূলত বিয়ের পথে বাধা সৃষ্টির কারণেই তৈরি হয়েছে। সমস্যাটা চক্রাকারে আবর্তিত। অর্থাৎ চারিত্রিক অধঃপতনের কারণেই আবার বিয়ের পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এক কবি বলেছেন-

চক্রাবর্তন সমস্যা এসেছে আমার মাঝে
আর যাকে ভালোবাসি, তার মাঝে।
যদি আমার বার্ধক্য না হতো, তাহলে সে বিরূপ হতো না।
সে বিরূপ না হলে আমার চুলে শুভ্রতা ছেয়ে যেত না।

বিয়ে যে কারণে প্রয়োজন সে প্রয়োজন পূরণ এখনকার যুবকদের হাতের নাগালে। সামাজিক প্রথা যে যুবককে বিয়ে থেকে বিরত রাখছে, সে বিয়ের প্রয়োজন ভিন্ন পথে সেরে নিচ্ছে। এভাবে সে নৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। সহজভাবে যৌনক্ষুধা নিবারণের ফলে বিয়ের প্রতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। কারণ তার ভাবনায় থাকে– বিয়ে মানে বিশাল আয়োজন, অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ, টাকা-পয়সার ব্যাপক ছড়াছড়ি ইত্যাদি। এর চেয়ে ভালো হলো সহজেই কাজ সেরে নেয়া। যা চাওয়ার তা যখন সহজেই পাওয়া যায়, তাহলে আর এত ঝামেলার মুখোমুখি হওয়ার কী দরকার!

মনে রাখবে, বৈবাহিক জটিলতা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যভিচার কিংবা পতিতাবৃত্তির জটিলতা এক সূত্রে গাঁথা। একটা বাদ দিয়ে আরেকটার সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের সমাজের পরতে পরতে এ সমস্যা ঘাপটি মেরে বসে আছে। যতদিন পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করা না যাবে, ততদিন হাজারো শান্তিচুক্তি করেও শান্তির সুবাতাস পাওয়া অসম্ভবই বটে।

৫. বিবাহের সংস্থান না হওয়া :

সুস্থ বিবাহের পথে পঞ্চম বাধাটি আমি এ লেখার শুরুতে ইঙ্গিত দিয়েছি। শুরুতে যে বিষয়ের সাথে পরিচিত করিয়েছি, তার ফলাফলই এ সমস্যা সমাধানের মোক্ষম উপায়। আমি সেখানে বলেছিলাম, বৈবাহিক জটিলতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো হাজার হাজার অবিবাহিত নারী ও পুরুষের বিদ্যমানতা।

যুবকদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তর রয়েছে। ধনী-গরিব, ভদ্র-মূর্খ, ফাসেক-মুত্তাকি, মেধাবী-দুর্বল প্রভৃতি।

মেয়েদের মাঝেও স্তরবিন্যাস রয়েছে। তাই কোনো যুবক যখন বিয়ে করতে চায়, তার জন্যে উচিৎ হলো, মেধা-মননশীলতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যে নিজের মতো কাউকে প্রস্তাব দেয়া, যেন চিন্তাচেতনায় সামাজিক ও বাস্তব জীবনের সর্বাংশে একজন নারী তার সহকর্মী ও সহযোগী হতে পারে।

বৈবাহিক জীবনে যখন এ ধরনের স্বভাবগত ভিন্নতা ও বৈপরীত্য থাকে, তখন কর্তব্য হলো, প্রতিটি এলাকায় একদল সংস্কারক লোক থাকা। তারা মানুষের কাছে এই সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন এবং সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

সারকথা হলো, সারা দেশে বৈবাহিক জটিলতা বিদ্যমান। এই জটিলতা নৈতিক ও চারিত্রিক বিপর্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির সংশোধন সম্ভব নয়। এসবের মূলে রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা। এরপর দেনমোহর নির্ধারণ, হাদিয়া-উপঢৌকন ও আনুষ্ঠানিক কুসংস্কারের সয়লাব।

তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী শরয়ী আহকাম উপেক্ষা করে থাকে। ফলে যেখানে তাদের মাঝে মিল-মহব্বত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে বিরোধ ও মনোমালিন্য হয়ে থাকে। বাবা-মা ও অভিভাবকদের রেখে নিজেরাই সব সম্পন্ন করে ফেলে। আবার কখনো এমন মেয়েদের বেছে নেয়া হয়, যারা বিবেচনায় ছেলের উপযোগী নয়। তারা কেবল গুণের পরিবর্তে সৌন্দর্যকে, দীনের বদলে সম্পদকে এবং চরিত্র ও নৈতিকতা না দেখে প্রেম-ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ফলে সমস্যার জাল ফসকা হওয়া অপেক্ষা দিন দিন ঠাসা হতে থাকে। পরিশেষে এর হাত ধরে অনুপ্রবেশ করে মনকষাকষি, হাতাহাতি, রেষারেষি, মামলা-মকদ্দমা, আত্মহত্যা, খুনখারাবি প্রভৃতি।

বিবাহেচ্ছুক এক যুবকের নীল কষ্ট

প্রতিদিন অসংখ্য পত্র এসে আমার হাতে জমা হয়। কোনোটি দেশি কোনোটি বিদেশি। তবে দেশি চিঠিই বেশি। আজো তার ব্যতিক্রম নয়। আজকের চিঠিগুলোর মধ্যে আমার সামনে এ মুহূর্তে দুটি পত্র রয়েছে। একটি লিখেছেন জনৈক যুবক চাকরিজীবী। অপরটি লিখেছেন একজন যুবতি।

প্রথম চিঠিটিতে আমাদের দেশের বড় বড় সামাজিক জটিলতার মধ্য হতে বিশেষ একটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দৃষ্টি আকর্ষণকৃত এ বিষয়টি কোনো মতবিরোধ ছাড়াই সবচেয়ে জটিল একটি বিষয়।

দ্বিতীয় চিঠিতে এই জটিলতা নিরসনের সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চাইলে একদিনেই পত্র দুটির জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু না! আমি পত্রদ্বয় নিয়ে ভাবতে সময় নিই। তবে পত্র দুটি কোত্থেকে এসেছে, তা পাঠক মহলকে জানানো থেকে নিবৃত্ত রইলাম। বিশেষ কারণে সেখানকার কোনো নাম ও শিরোনাম আমি উল্লেখ করলাম না।

প্রথম চিঠিটির লেখক লিখেছেন, তিনি একজন সাধারণ চাকরিজীবী। তিনি মাসিক দুইশত 'লিরা' ভাতা পেয়ে থাকেন। ভদ্র বংশের লোক। সুন্দর গঠন

ও অবয়বের অধিকারী। তিনি চান বিয়ের মাধ্যমে নিজেকে হেফাজত করতে এবং পরিবার ও বংশধারা অব্যাহত রাখতে। এ উদ্দেশ্যে তিনি এক মেয়েকে প্রস্তাব করলেন। যথারীতি মেয়েপক্ষ ছেলের খোঁজখবর নিতে এলো। তারা ছেলের শারীরিক গঠন ও দীনদারির ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করল। তবে আপত্তি জানাল যে বিষয়টিতে তাহলো ছেলে সামান্য বেতনে চাকরি করে। কী আর করা! স্বল্প বেতনের চাকরিজীবী সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

এবার আরেকটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। যেহেতু আগেরবার ধকল খেয়েছেন তাই তিনি এবার আগেভাগেই মেয়েপক্ষকে বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি অল্প বেতনে চাকরি করেন।

জবাবে তারা বলল, বেতন? এটা কোনো ব্যাপারই না! এটা আর কী? এটা কি বেচাকেনা যে, ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে হবে? আমরা ধনসম্পদের বিবেচনা করি না।

ব্যাস! এতে তিনি খুশি হয়ে বললেন, এখানেই তো সৌন্দর্য!

যুবকের চোখের তারাগুলো আনন্দে নেচে ওঠলো। তিনি মনে মনে যেমন চেয়েছিলেন তেমনই পেতে যাচ্ছেন। এ খুশির আবহে বিষয়টি শেষ প্রান্তে এসেছিল প্রায়। কিন্তু শেষমেষ কনেপক্ষেরই দূরসম্পর্কের কোনো আত্মীয় তাদের কান ভারী করলো যে, টাকা পয়সা ছাড়া এখন চলে না। অবশেষে রণেভঙ্গ।

কিন্তু যেহেতু আলোচনা শেষ ধাপে চলে এসেছে, সেহেতু কিভাবে নিষেধ করবে তাও তাদের কাছে ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে তারা কারো মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, ছেলে দেখতে তেমন সুন্দর নয়। অথচ তিনি সুন্দর। (পত্রের লেখক নিজের ব্যাপারে সৌন্দর্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন; আমি নই। আমি তাকে দেখিওনি। তার চেহারা সম্পর্কে জানিও না।)

এবার তৃতীয় আরেক জায়গায় প্রস্তাব পাঠালেন বেচারা। তাদেরকে প্রথমেই জানিয়ে দিলেন যে, আমরা কোনো ধরনের জটিলতা, শর্তারোপ, অনুষ্ঠান-আয়োজন কিছুই করতে পারব না। আমি নিম্নপদস্থ চাকরিজীবী। মাসিক বেতন সিরীয় দুইশত লিরা মাত্র। আর আমার দেহ! এ তো আপনাদের সামনেই উপস্থিত। তারা বলল, আমরা আপনার গঠন ও বেতনে সন্তুষ্ট। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

পাত্রীপক্ষের স্বাগত জানানোয় এবার সহজেই যুবকের চোখের তারা নেচে ওঠল না। কারণ আগে বারদুয়েক যেই ধকল খেয়েছেন এখন আবার কোন ধকল আসে তারই অপেক্ষায় তিনি।

হ্যাঁ, যেমনটি ভেবেছিলেন তেমনটিই হলো। মেয়েপক্ষ কাচুমাচু করে বলল যে, মেয়ের বড় বোনের দেনমোহর ছিল চার হাজার। আমরা ছোট মেয়ের মোহর তার কম নির্ধারণ করতে পারি না। তিনি চার হাজার লিরার কথা শুনে বললেন, আসসালামু আলাইকুম!

এবার চতুর্থ মেয়ের পালা। একবার যুবকের মনে চায় বিয়েই করবে না। আবার তার মনের মাঝে উঁকি দেয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমীয় বাণী– 'যে আমার সুন্নাত বিবাহ হতে নিজেকে গুটিয়ে রাখে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

কী আর করা! এ পথে যে তাকে হাঁটতেই হবে। এবার তিনি চতুর্থ মেয়েপক্ষকে প্রস্তাব পাঠান। মেয়েপক্ষকে আগেভাগেই বলে দিলেন, আমার বেতন এত। আমার দেহ এমন। এক হাজার লিরা থেকে বেশি দেনমোহর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জবাবে মেয়েপক্ষ বলল, আমরা মেনে নিলাম।

যথারীতি কথাবার্তা, আলোচনা প্রায় শেষ। যাওয়ার আগে তারা বলে গেলেন যে, আমাদের মেয়ে আপনার কাছে থাকবে। তার সুখ-দুঃখ দেখা আপনারই দায়িত্ব। তাই তার জন্যে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেবেন। আর শোয়ার রুমটা আসবাবপত্রে সজ্জিত করবেন। এতটুকুই যথেষ্ট।

মেয়েপক্ষের এ আব্দারে বেচারার কলজে মোচড় দিয়ে ওঠল। কারণ এই আবেদন যে পূর্বের দেনমোহর অপেক্ষা ভারী! অগত্যা তিনি সেখান থেকেও পালিয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর পেলেন না।

সর্বশেষ পঞ্চম এক মেয়েকে প্রস্তাব পাঠালেন। এ স্থানেও সবকিছু খুলে খুলে বর্ণনা করলেন। তারাও সম্মতি জানাল। মেয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করল। তিনি টাকা-পয়সা জমা করলেন।

বিয়ের আয়োজন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

কিন্তু শেষ প্রান্তে এসে মেয়েপক্ষ সব গুঁড়িয়ে দিল। কারণ, ছেলের মা ছিলেন গ্রাম্য মহিলা। তিনি নাকি এক মহাঅপরাধ (?) করে বসেছেন। অনুষ্ঠানের নিয়মনীতি, শোভা-সৌন্দর্য, আধুনিক ভদ্রতা সম্পর্কে তার নাকি ন্যূনতম ধারণা নেই। তিনি নাকি অলিমা অনুষ্ঠানে খেতে বসে গোশত

কাটার চামচ দিয়ে তরমুজ খেয়েছিলেন। তরকারির ঝোল আর পাতলা ডাল নাকি জোরে জোরে আওয়াজ করে চুমুক দিয়ে খাচ্ছিলেন। আপেলের খোসা ছাড়াচ্ছিলেন আর ফলটা হাতে ধরে রেখেছিলেন। প্রশ্নকর্তা হয়তো গ্রাম্য এই মায়ের আরেকটি অপরাধের কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। তাহলো, যখনই তিনি খাবার চিবুচ্ছিলেন, তখন তার থুতনি নড়ে উঠছিল! হায় নিয়তি! হায় সভ্যতা!

পরিশেষে বেচারা বিয়ের চিন্তাই ছেড়ে দিলেন। নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হলো তার। তিনি এই লেখার ইতি টেনেছেন নারী ও তাদের বাবাদেরকে কিছু গরম ও প্রতিশোধমূলক গালি দিয়ে।

সত্যিই আমাদের আত্মশুদ্ধির বড় প্রয়োজন। আমরা আত্মশুদ্ধ হলে এমন আহাম্মকি কায়-কারবারের দিকে ধাবিত হতাম না। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও। তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর প্রতিই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করেন। *[সূরা মায়িদা : ১০৫]*

আজ আফসোসের সাথে বলতে হয়, আমিও একজন বাবা। আমারও মেয়ে আছে। এই যুবকের নীলকষ্ট মাখা ভর্ৎসনার ছিটে যে আমার গায়েও এসে পড়েছে! কারণ আমি যে এই সমাজেরই একজন! আমি কি এড়িয়ে যেতে পারব সমাজের এই নোংরা খেলা?

বিবাহযোগ্য এক যুবতির করুণ আর্তনাদ

এবার আসি দ্বিতীয় চিঠি প্রসঙ্গে।

আগেই বলেছি দ্বিতীয় চিঠিটির লেখিকা এক যুবতি। তিনি চিঠিতে যা উল্লেখ করেছেন, তাতে তার বুকে জমা করুণ আর্তনাদই ফুটে ওঠেছে। কিন্তু তিনি যে অসহায়! তার যে কিছু করার নেই। মুখ বুজে যৌবনা দেহকে তিলে তিলে হারাতে বসেছেন তিনি। তিনি লিখেছেন যে, তিনি যে পরিবারে

জন্মগ্রহণ করেছেন সেই পরিবারে তারা তিন বোন। তিনি সেই তিন বোনের একজন। বড়ভাইয়ের বাসায় একসাথে তারা সবাই থাকেন। বড়ভাই তাদেরকে আদুরে চোখে দেখেন। বাবার মতোই তিনি তাদের সকল আব্দার রক্ষা করে চলেন। তিনি তাদের জন্যে খরচের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কমতি করেন না। মায়াঘেরা এক স্বর্গোদ্যান তাদের পরিবার।

কিন্তু বিপত্তি সব অন্য জায়গায়। যখনই কোনো বোনের বিয়ের জন্য কোথাও থেকে প্রস্তাব আসে, ঐ ভাই মহোদয় নানা অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। প্রস্তাবিত পাত্র সম্পর্কে বড়ভাই ভাবেন যে, এই লোকটি কৃপণ স্বভাবের হবে হয়তো। তার কাছে বিয়ে দিলে আমারে আদুরে বোনের কষ্ট হবে! কখনো ভাবেন যে, ওই লোকটা মূর্খ, বকলম। অথচ তিনি বড় জ্ঞানী। সে তার উপযোগী হয় কিভাবে? কোনো ব্যাপারে মাসয়ালার প্রয়োজন হলে সমাধান হবে কীরূপে?

যুবতির বড়ভাই কখনো ভাবেন যে, অমুক ভদ্রলোকের পরিবারের সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি। তাদের মা, বোন, ভাইয়ের বৌ সবাই জীবিত আছেন। এ কারণে তিনি আশঙ্কা করেন যে, তারা সবাই মিলে বোনের ওপর জুলুম করবে!

কখনো এমন কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসেন যে, তার মাঝে কোনো দোষ খুঁজে পান না। অগত্যা বেচারাকে প্রথমে দেনমোহরের বোঝা, তারপর আরও দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। এভাবে তারা তিন বোন জীবনের দীর্ঘ সময় পার করেছেন কুমারী অবস্থায়।

এই হলো পৃথক দুটি পত্রের ভেতরের কথা।

যুবক-যুবতিদের উচ্ছন্নে যেতে দায়ী কে

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আজ আমাদের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ একটি সমস্যা আলোচনা করব। তাহলো, ঘরে ঘরে সেয়ানা যুবতি-কন্যারা বিয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। অন্যদিকে অবিবাহিত যুবকরা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। তারা বিয়ের পথ খুঁজছে। অলিগলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই দু'দলের মাঝে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে আছে। যে অন্তরায় তাদেরকে হালাল মিলনের পথে বাধা দিচ্ছে। পক্ষান্তরে তাদের সামনে রঙিন অবয়বে ধরা দিচ্ছে যেনা আর ব্যভিচারের ময়লা পথ। অথচ কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। *[বনি ইসরাঈল : ৩২]*

আমি বলি যে, এই যুবক-যুবতিদের তারুণ্যদীপ্ত জীবনকে বৈধ পথ বিসর্জন দিয়ে অবৈধ পন্থায় কাজে লাগাবার পেছনে অনেকাংশে আমাদের অভিভাবক দায়ী। আর এ কারণেই যুবক-যুবতিরা জৈবিক চাহিদা মিটাতে নানা পন্থা অবলম্বন করে থাকে। কারণ সেখানে কোনো বাধা-বিপত্তির ধার তাদের ধারতে হয় না।

যুবক-যুবতিদের উচ্ছন্নে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছেন সম্মানিত বাবারা। ক্ষমা করবেন! আমি সব বাবাকে উদ্দেশ্য করছি না; বরং যারা এখনও উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, জগতে বর্তমানে ধ্বংসকারী প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলছে। যে বাতাস চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, ইজ্জত-আবরু সবকিছু ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে। এর কোনো প্রতিষেধক নেই। মুক্তির কোনো উপায়ও নেই। একটিমাত্র পথ খোলা। সেটি হচ্ছে বিয়ের দরজা।

মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি বিয়ে-শাদিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা এ পথে শর্তারোপের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি করে কিংবা সহজভাবে কার্যসম্পাদন করতে পেরেও সহজায়ন করে না; তিনি এই মহাসঙ্কটের অন্যতম নায়ক। তিনি জটিলতা সৃষ্টির অন্যতম ভূমিকা পালনকারী।

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষে অসুবিধা থাকলেও মেয়ের দিকে অসুবিধার মাত্রাটা একটু বেশি। কারণ, যুবক অপরাধ করে খালাস হয়ে যায়। কিন্তু যুবতি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। তাছাড়া আমাদের সমাজব্যবস্থাও যুবকদের ক্ষমা করে দেয়। তাদের ক্ষেত্রে বলে, আরে! একটা যুবক মানুষ। কিছু একটা দোষ না হয় করেছে। তওবাও তো করেছে! কিন্তু মেয়ের বেলায় ক্ষমার এই দৃষ্টিটা দেয়া হয় না। তাকে চিরঅপরাধী হিসেবেই দেখা হয়। তাকে মনে করা হয় অলুক্ষণে। তাকে ভাবা হয় নষ্টা-পাপীষ্ঠা!

হ্যাঁ, মেয়ের বাবা যদি বিচক্ষণ হন, তাহলে কন্যার বিয়ের ব্যাপারে জলদি কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এই অর্থে নয় যে, মেয়েকে বাজারে উপস্থাপন কিংবা প্রথমবার যে প্রস্তাব দেয়, তার হাতেই সোপর্দ করেন। বরং তার

জন্যে শরিয়তসম্মত পথের অনুসন্ধানে মগ্ন থাকেন। ছেলের দীনদারি, চরিত্র ও নীতির সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

দীনদারি ও নীতি-নৈতিকতা পছন্দ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ছেলের পরিবার তাদের আচার-আচরণ এবং চিন্তাচেতনায় দৃষ্টি দেন। যদি ছেলে ও তার পরিবারের উপযোগী হয়, অর্থসম্পদে এবং বংশগত দিক থেকে কাছাকাছি হয়, সেই সাথে মেয়ে বাবার ঘরে যেভাবে লালিত হয়েছে স্বামীর বাড়িতেও সেভাবে জীবনযাপন করতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় তাহলে বাবা এবার কবুল করে নেন।

বিবাহের অপরিহার্য অংশ হলো দেনমোহর। তবে হ্যাঁ, তা অবশ্যই মধ্যম পর্যায়ের হওয়া চাই। যেন প্রস্তাবিত দেনমোহর ছেলের ওপর বোঝা না হয়, আবার মেয়ের হকও নষ্ট না হয়। যদি ছেলে সৎ হয় আর হাতে টাকা-পয়সা তেমন না থাকে (অধিকাংশ যুবকের অবস্থাই এমন) তাহলে মোহর বাকিতে পরিশোধ হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দিলে দেনমোহরের পরিমাণ বেশি হলেও কিছুটা অবকাশে আদায় করা হলে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না।

বিবাহের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় আবশ্যিক নয়, প্রত্যাশিতও নয় বরং বিবাহবন্ধনে সমস্যা সৃষ্টি করে, সেগুলো হচ্ছে প্রচলিত অনুষ্ঠান-আয়োজন। এসবের জন্যে অভিভাবককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

এক্ষেত্রে আমার সহজ সরল উক্তি হলো, স্বামী-স্ত্রীর জন্যে যতটুকু উপকারে আসে, তার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। স্বামী-স্ত্রীর উপকারে যা আসে না, এমনকি যা অতিরিক্ত তাই নিষিদ্ধ তথা নাজায়েয।

কুসংস্কারের ছোবলে বিক্ষত পবিত্র বিবাহ

আমাদের সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নানা আয়োজন প্রচলিত। এসব কুসংস্কারের বিষাক্ত ছোবলে বিবাহের মতো পবিত্র ইবাদত আজ ক্ষতবিক্ষত। যেন এই আয়োজনের দায়ভার দেনমোহরের চেয়েও বেশি! এই কুসংস্কার কখনও ছেলেকে কখনও মেয়ের বাবাকে কখনও আবার উভয়কে ঝাঁজিয়ে তোলে। এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বিয়ের অনুষ্ঠান অবশ্যই হবে। কারণ, এটি সুন্নাত। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। তাহলো, কাপড়চোপড় আর পোশাক-পরিচ্ছেদ।

আমি এক স্যুট পোশাক পরে বিশটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। অথচ একজন মা তার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রথম মেয়ের বিয়ের কাপড় পরে যেতে রাজি হন না। তাদের মনের মাঝে উঁকি দেয়– হায়রে আমার পোড়া কপাল! আমি দুর্ভাগা মা! আমাকে এক কাপড়ে দু'বার দেখলে মানুষ কী ভাববে?

একই অবস্থা বোনের, চাচীর, চাচাত বোনের এবং প্রতিটি মেয়ের। তারা সবাই নিজেদের স্বামীকে অনুষ্ঠানের জন্যে নতুন কাপড় কেনার জন্যে চাপ প্রয়োগ করে। মূলত এমন একটি অনুষ্ঠান চল্লিশটি পরিবারের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। কখনও তাদের মাঝে এমন বিরূপ ভাব সৃষ্টি করে ফেলে যে, সাংসারিক জীবনে ফাটল ধরে যায়। যা আর জোড়া লাগে না। এর খেসারত দিতে হয় বছর বছর ধরে।

এই তো গেল একটি দিক।

বিবাহের দ্বিতীয় কুসংস্কার হলো ফুলশয্যা সাজানো।

আমি একটি বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানি। সেখানে একেক আইটেমের ফুলের দাম এক হাজার লিরা। এমন কয়েক প্রকারের ফুল! গোলাপ, জবা, পলাশ, জবা, ডালিয়া, সূর্যমুখী আরো কতো কী! আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন যে, সেখানকার অবস্থা কেমন হয়েছিল? ফুলগুলোতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। থরে-থরে সাজানো, ছড়ানো ছিটানো ছিল। পরে এগুলো সরাতে ট্রাক ভাড়া করা হয়েছিল! হাজার হাজার লিরা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হলো! অথচ শহরে হাজারো পরিবার একটি লিরার জন্যে পথ চেয়ে থাকে তীর্থের কাকের মতো।

তৃতীয় কারণ জামাকাপড় রাখার বক্স। একটি বক্সের দাম কম করে হলেও পাঁচ থেকে সাত পিয়াস্টার। কোনোটির মূল্য পাঁচ লিরা পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাহলে ভাবুন, সাধারণ পর্যায়ের একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে কী পরিমাণ পয়সা খরচ হয় শুধু এই বক্সের পেছনে?

এখানে কেবল মধ্যবিত্ত পরিবারের খরচপাতি ও আয়োজন নিয়ে আলোচনা করলাম। উচ্চবিত্তদের বিয়ে-শাদিতে, অন্যায়-অশ্লীল কাজে সম্পদের যে অপচয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

বিষয়টি যদি এখানেই ক্ষ্যান্ত হতো তবে আর কথা ছিল না। কিন্তু ঘটনা এই অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়।

এছাড়াও চতুর্থ আপদ হিসেবে রয়েছে বৌ-ভাত, চুক্তিকৃত হাদিয়া। এটিই সর্বশেষ আপদ। এসব পেয়ে আপনি বেশ খুশি হবেন। এ সময়ে এত হাদিয়া পাবেন, যেগুলো আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমন্ত্রিতরা চেয়ার, ডাইনিং টেবিল, খাট-সোফা ও বিভিন্ন ফার্নিচার দিয়ে ঘর ভরে দেবে। অথচ আপনার বাড়ির রুম মাত্র চারটা। এসব রাখারও জায়গা হয় না।

কিন্তু এ পর্যন্তই কি শেষ? না! এখানেই শেষ নয়। যদি আপনি এগুলো বিক্রি করতে চান, তাহলে মানুষ আপনাকে 'ছোটলোক' বলবে। তাহলে কী করবেন এসব দিয়ে? এরপর সাথে সাথে আপনার থেকে এই ঋণ পরিশোধের তাগাদা আসবে। যারা হাদিয়া দিল, তাদেরও তো আনন্দ-আয়োজন হবে। তখন! আপনি ভাববেন, অমুকের মেয়ের বিয়ে। তার বাড়িতে আনন্দ-উল্লাস চলছে। সমাজের সঙ্গতি রেখে তার বাড়িতে না গেলে কি প্রেসটিজ রক্ষা হয়? তিনি আমাদের মেয়ের বিয়েতে উচ্চমূল্যের জাপানি গিফট দিয়েছিলেন। আমি যদি তার চেয়ে বেশি দামের না দিই তাহলে সমাজ ব্যাপারটি কেমন ভাববে?

আপনি হয়তো বলবেন যে, আরে! আমি কি অমুকের কাছে এই দামি জিনিসটি চেয়েছিলাম? ওটা আমাদের কিইবা কাজে এসেছে? বরং ধুলা জমে মেয়ের বাড়িতে পড়ে আছে। ভাগ্যিস! আমাদের এখানে নেই। যদি আমার বাড়িতে থাকত, তাহলে সব সময় ভয়ে-ভয়ে বুক দুরুদুরু করত, কখন জানি খাদেমা ভেঙে ফেলে অথবা বাচ্চারা ছুড়ে মারে!

কিন্তু স্ত্রী বলবে, আপনি যা-ই বলুন, কিছু একটা তাদের দিতে হবে। না হয় মানুষ কী বলবে! মান-ইজ্জত সবই যাবে!

এভাবে আপনাকে উৎপীড়ন করতে থাকবে। কান দুটো ভারী করে তুলবে। এক পর্যায়ে আপনি মেনে নিতে বাধ্য হবেন। সারেন্ডারের শাদা নিশান উড়িয়ে দেবেন এবং বলবেন, নাও! পরিবারের খাদ্যের পয়সা! মানুষের জন্যে কিনে এনো! এভাবে মেয়ের মায়েরা স্বামীদের ওপর নির্যাতন করে থাকেন এবং এসব অপসংস্কৃতি প্রচারে সহায় করে যান। এটাই বিয়ের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

আমরা যদি এ ধরনের বড় বড় আয়োজন বর্জন করে নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম এবং দামি-দামি বস্তুসামগ্রী উপঢৌকন দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারতাম। যেমন শাহি পালঙ্ক, যা সারা জীবনে চার-

পাঁচবারের বেশি ব্যবহার হয় না। মূলত এসব কীর্তি কলাপের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে প্রদত্ত আমানতেরই খেয়ানত করছি। যার জবাবদিহি অবশ্যই আমাদেরকে করতে হবে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত কর না আল্লাহর সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খেয়ানত কর না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনেশুনে। *[আনফাল : ২৭]*

একটি পালঙ্কের মূল্য কমপক্ষে একশ লিরা তো হবেই। আর সর্বোচ্চটির 'মূল্য' থেকে আল্লাহর পানাহ! যদি এসব পরিহার করতে পারি, তাহলে বর-কনের অতিরিক্ত পোশাক ও সাজসরঞ্জামেরও প্রয়োজন হবে না।

দেখুন, বিয়ের কাপড় মাত্র একদিন পরিধান করে আলমিরায় ফেলে রাখা হয়। যেমন করে কঙ্কাল সাইন্সের কলেজে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাহলে কী প্রয়োজন মাত্র কয়েক দিনের জন্যে এত মূল্য দিয়ে জামাকাপড় ক্রয় করার? কারও থেকে ভাড়াও তো নেয়া যায়! ওহহো ভাড়া নেয়া! তাতে যে মান-ইজ্জত বলতে আর কিছুই রইল না! এতে যে জাত-কুল উভয়ই পাংচার হবে!

তাই আমাদের দেখা উচিৎ, এ সমস্ত খরচাপাতির মধ্যে কোনটি বর-কনের পারিবারিক জীবনে প্রয়োজন। দেখা দরকার তারা কোন কোন বস্তুর মূল্য পরিশোধে সমর্থ। যেসব জিনিসের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যই থাকে মানুষের মাঝে আকর্ষণ সৃষ্টি করা– যেমন বাসরের কাপড়, ফুলশয্যা সজ্জায়ন, পালঙ্ক উপহার, ফুলের তোড়া স্যুটবক্স– এগুলো পরিহার করতে হবে।

আমাদের প্রত্যেকেই চান মানুষ তাকে ভালো বলুক, সামান্য প্রশংসা করুক। কিন্তু এক হাজার লিরা ব্যয় করে প্রশংসাবাক্য 'মাশাআল্লাহ' শোনা একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। কারণ, এর মূল্য নিতান্তই কম এবং এর আবেদন বড়জোর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এ কয়েক ঘণ্টার মাশাআল্লাহ কিংবা মারহাবা অথবা ধন্যবাদ শব্দ শোনার জন্য এত বিপুল পরিমাণ অর্থ শ্রাদ্ধের কোনো মানে হয় না। অন্তত বিবেকবান মানুষ এমনটি করতে পারে না।

উপসংহারে বলব, প্রথম পত্রটির লেখায় কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে। কারণ যদি তিনি নিজের উপযোগী এমন কাউকে প্রস্তাব দিতেন, যারা পূর্ব থেকেই তার সম্পর্কে জানে-চেনে, তাহলে প্রস্তাব খুশিমনে মেনে নিত। তাহলে আর

তারা তার দৈহিক গঠন, অর্থসম্পদ ও পিতামাতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ পেত না।

আর দ্বিতীয় পত্রটির লেখিকার বিষয়টি সৎ ও যোগ্য ছেলের সন্ধান পাওয়ার পর কাজীর কাছে পেশ করেছি। কাজী সাহেব ছেলের সততা ও দিয়ানতদারির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বিয়ের কার্য সম্পন্ন করেছেন। যদিও মেয়ের অভিভাবক কোনো জামাইর প্রতি খুব একটা রাজি ছিল না।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা বিয়েসংক্রান্ত যে সমস্ত জটিলতার কথা উল্লেখ করলাম, এর থেকে উত্তরণের সহজ পথ হলো বৈবাহিক সম্বন্ধ সহজতর করা। আমি মনে করি, যে লোক বিয়ের জন্যে চেষ্টা চালায় এবং পূর্ণতার জন্যে পথ অন্বেষণে থাকে, অবশ্যই সে নেক ও কল্যাণ প্রচেষ্টায় রত। সে দেশ ও দীনের সেবায় আত্মনিয়োজিতদের অন্তর্ভুক্ত।

এ পর্যায়ে যাদের কাছে মেয়ে আছে তাদের বলি, ভালো পাত্রের প্রস্তাব এলে ফিরিয়ে দেবেন না। যুবকদেরও বলি, আপনারা দ্রুত বিয়ে করে ফেলুন। কারণ, ফরজসমূহ আদায় এবং হারাম থেকে বিরত থাকার পর বিবাহ থেকে উত্তম কোনো নেক আমল আপনারা করতে পারেন না। এর মাধ্যমে চরিত্র ও দীন উভয়ই রক্ষা পাবে।

হে শহরের গুণীজন! হে সংস্কারকর্মের দাঈগণ! হে কলমের অধিপতিরা! হে মিম্বরে খোতবাদানকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! বিবাহকে আপনারা কাজের প্রথম ও প্রধান স্থানে রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই প্রচেষ্টাকারীদের তাওফীক দান করেন এবং অধিক প্রতিদানের ফয়সালা করবেন।

সেক্স খেলা! সেক্স কালচার

এক সময় সেক্স কথাটি বলতেও লজ্জাবোধ হতো। কিন্তু সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে, সেক্স শব্দ কিংবা সেক্সখেলা যেন সহজায়ন হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের পাঠ্যবইগুলোতে পর্যন্ত সেক্স শেখানো হচ্ছে। এতে যে আমাদের ছেলে মেয়েরা অজানা অন্ধকারের দিকে হারিয়ে যাচ্ছে তা কেউ তলিয়ে দেখে না।

ইদানীংকালে খোদ আমেরিকাও এসব নোংরামি থেকে নিজেদের প্রজন্মকে বাঁচাবার মিশন হাতে নিয়েছে। তারা কথিত গবেষণা করে দেখেছে যে, যৌনশিক্ষাকে সবার বোধে আনলেই এসব থেকে আকর্ষণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। কিন্তু এতে যে হিতে বিপরীত হচ্ছে তা তারা তলিয়ে দেখছে না।

কথিত গবেষকরা এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যৌনসচেতনতা বা সেক্সশিক্ষা নামে একটি বিষয় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে তা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠদান করছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি! আমি মনে করি, এর মাধ্যমে তারা আগুনের মধ্যে পেট্রোল ঢালছে। অল্পবয়স্ক নির্দোষ বালিকার মধ্যে লুক্কায়িত যৌন স্পৃহাকেই তারা জাগিয়ে তুলছে। স্কুল পর্যায়ের ছাত্রীদেরকে তারা কনডম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং একজন পুরুষ নির্জনে একজন মহিলার সাথে কী করে তারা উঠতি বয়সের বালিকাদেরকে তাও শিক্ষা দিচ্ছে।

মূলত আমাদের মধ্যে বসবাসকারী এক ধরনের মানুষ নামধারী শয়তান আমাদেরকেও তাদের শয়তানি কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করার আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু ইসলামি অনুশাসনই যে এ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে তা ভেবে দেখার লোকের আকাল বললেও অত্যুক্তি হবে না। এসব বিষয়ে জনসচেতনতা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।

একটু আগেও ইউরোপ-আমেরিকার সামাজিক ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি। এবার কথিত সভ্য দেশ দাবিদার এক দেশের কথা শোনাব। আমার রূহানি সন্তান যারা আছে তাদের চেতনায় শান দেয়ার জন্যই এ বিষয়টির অবতারণা করছি−

বিশ্বমোড়ল দাবিদার যুক্তরাষ্ট্রের কথা কে না জানে! সেই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে ১৯৮২ সালের ৩০ নভেম্বর রয়টার পরিবেশিত খবরে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, ১৬ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই সে দেশের মেয়েদের কুমারীত্ব লোপের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। আর তরুণীদের কথা! সেই খবরে বলা হয়েছে যে, তরুণী ভার্যাদের অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্ভোগের হারও আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। বিখ্যাত প্লেবয় ম্যাগাজিন তরুণ পাঠকদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

বলতেও আমার সংশয় হচ্ছে। আবার না বলেও পারছি না। কারণ তরুণীদের সতর্ক হওয়ার জন্য এবং স্ব স্ব ইজ্জত হেফাজতের জন্য এ কথাগুলো জানা অতি প্রয়োজন। সেই শিউরে ওঠার মতো তথ্য হলো, প্লেবয় ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট তরুণ পাঠকদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করে যে, নির্ধারিত ১৩৩টি প্রশ্নের জবাব পাঠিয়েছে ম্যাগাজিনের ৮০ হাজার পাঠক। যাদের শতকরা ৮৯ ভাগ পুরুষ। জরিপে

বলা হয়, ২১ বছরের নিচের শতকরা ৫৮ ভাগ মেয়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই সেক্সখেলা তথা যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে একই বয়সের ছেলেদের যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার হার হলো ৩৮ ভাগ। এসবই সেক্স খেলা ও সেক্স শিক্ষার বদৌলতে হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ডক্টর আইডিমিয়াম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পুরাতন গোত্রসমূহের লোকদের জীবনী অধ্যয়ন করেছেন। এ অধ্যয়নের পর তিনি সভ্য সমাজের লোকদের জীবনীও পাঠ করেছেন। তারপর তিনি এ বিষয়ক প্রামাণ্য গবেষণা রিপোর্ট স্বীয় বই 'সেক্স কালচার'-এ খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তিনি বইটির ভূমিকায় লিখেছেন– আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের পর যে ফলাফল লাভ করেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, প্রতিটি জাতি দুটি জিনিসের ওপর নির্ভর করে। একটি হলো তাদের সম্মিলিত জীবনব্যবস্থা, অপরটি হলো এমন আইনশৃঙ্খলা। যা তারা যৌন চাহিদার ওপর আরোপ করে। তিনি আরো লিখেন যে, যদি আপনি কোনো জাতির ইতিহাসে দেখেন যে, কোনো সময় তাদের সভ্যতা উন্নত হয়েছে অথবা নিচে নেমে গিয়েছে তাহলে আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন যে, তারা যৌন বিষয়ক আইনে রদবদল করেছে। যার ফলাফল সভ্যতার উন্নতি অথবা অবনতির আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

ডক্টর আইডিমিয়াম তার 'সেক্স কালচার' গ্রন্থে আরো মন্তব্য করেন যে, মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, যৌনাচারের ওপর আইন আরোপ করা হলে তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, জাতির কর্ম ও চিন্তা-চেতনার শক্তি ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যে জাতি নারী-পুরুষকে অবাধ যৌনতার সুযোগ দেয়; তাদের কর্মক্ষমতা, চিন্তাশক্তি এবং যোগ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

রোমীয়দের অবস্থাও তাই হয়েছিলো। রোমীয়রা আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে অবাধে পশুর ন্যায় যৌনতায় লিপ্ত হতো। ফলে তারা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং কোনো কাজ করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের রোজনামচা

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ কিছু কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। তাহলো, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ২১ থেকে ২৯ বছর বয়স্কা বিবাহিতা মেয়েদের শতকরা ৩৫ ভাগ পরপুরুষের সঙ্গে যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকৃত। একই বয়সের বিবাহিত পুরুষরা অন্য নারীর সঙ্গে সহবাসের হার শতকরা ২৫ ভাগ।

এ ক্ষেত্রে লোমহর্ষক কথা হলো, আজকাল এসব সংবাদে তথাকথিত সভ্য জগৎ বিচলিত হয় না বা অবাকও হয় না। অথচ তারা কেউই তলিয়ে দেখছে না যে, এতে সকলের অজান্তেই তাসের ঘরের মতো করে সমাজের ভিত্ ধসে যাচ্ছে।

তাবৎ দুনিয়ার মানুষই জানে যে, যুক্তরাষ্ট্র আজ সভ্য দেশের তালিকার শীর্ষস্থান দখল করে আছে। চোখ বুজে একটু ভেবে দেখুন তো, যদি একটি সভ্য দেশের অবস্থা এই হয়, তবে অসভ্য দেশের মেয়েদের অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে? তাদের মাঝে অসভ্যতার প্লাবন কতটা দুর্বার গতিতে চলছে তা কল্পনা করতেও মাথা হেঁট হয়ে আসে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি খবরে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসবে। আজ সেই নির্লজ্জ খবরই জানাতে হচ্ছে। তাহলো, ফেডারেল সরকারের হিসেব মতে, জারজ সন্তানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুতহারে বাড়ছে। এই বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। উপরন্তু বাড়ছে বৈ কমছে না।

সত্তর দশকের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রে জারজ সন্তানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০ ভাগ। সে দেশে প্রতি ৬ জনে মাত্র একজনের জন্ম হয় বিবাহবন্ধনের বাইরে। ১৯৭৯ সালে ৫ লাখ ৯৭ হাজার অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। ১৯৭০ সালের তুলনায় এ সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে। ১৯৯৩ সালে তা ৮০ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। দেশব্যাপী শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক-তৃতীয়াংশের এবং কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীদের শতকরা ৪৩ জনের রয়েছে অবৈধ সন্তান।

আমেরিকার জনস হপকিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জরিপের সমীক্ষা অসংখ্য যুবতির হৃদয় নাড়া দিতে পারে। ঐ সমীক্ষায় বলা হয় যে, সেখানকার শতকরা ১৪ ভাগ কুমারী প্রথম সঙ্গমের আগে জন্মনিয়ন্ত্রণের পরামর্শ নেয়। কোনো কোনো মেয়ে অবৈধ সন্তানের মা হওয়াকে পূর্ণতা প্রাপ্তিলাভ বলে মনে করে।

ঐ জরিপে আরো বলা হয়েছে যে, যৌনাচার, মাদকদ্রব্য সেবন এবং অ্যালকোহলের প্রচুর ব্যবহারজনিত কারণে প্রায় ২ কোটির অধিক আমেরিকান পুরুষত্বহীনতায় আক্রান্ত। এছাড়া আরো লাখ লাখ নারী-পুরুষ প্রায়ই এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। এই হলো একটি সভ্য দেশের সংক্ষিপ্ত রোজনামচা।

এই যদি হয় সভ্য দাবিদারদের কারবার তাহলে যাদের মাঝে তুলনামূলকভাবে সভ্যতার জোয়ার কম তাদের মাঝে এ অবাধ যৌনাচার কোথায় গিয়ে ঠেকে থাকবে?

কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো

আমরা 'খাও দাও ফুর্তি কর আগামীকাল বাঁচবে কিনা বলতে পার' নীতি পোষণ করি। তাই যৌবনটাকে উপভোগ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠি। লজ্জাকর কথা হলো, আজ আমাদের সমাজেরও যৌনচাহিদা নিবারণ ইউরোপের মতোই সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। ফলে আমাদের কচি প্রজন্ম বাল্য বয়সেই যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমরা কেউই ভেবে দেখি না যে, আমাদের এই টগবগে তারুণ্যে এক সময় নিঃসন্দেহে ভাটা নামবে। তখন বৃদ্ধ ষাঁড়ের গাভীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখার মতো আর করার কিছু থাকে না। আমরা ঘুণাক্ষরেও ভাবি না যে, এই সোনালি দিনগুলোয় এক সময় বিকেল আসবে, আসবে সন্ধ্যা। তখন আমার দিকে ফিরে কেউ তাকাবারও থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে এবার এক ইউরোপ ভ্রমণকারী পর্যটকের কথা শুনাব। তিনি লিখেছেন—

আমি বেলজিয়ামের কোনো এক শহরের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পথচারী পারাপারের জন্য সিগন্যাল খুলে দেয়া হলো। আমি দেখলাম এক বৃদ্ধা রাস্তা পার হতে চাচ্ছে। তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, তার হাত-পা কাঁপছিল। গাড়িগুলো প্রায় তার উপর দিয়ে ওঠে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। কিন্তু কেউ তার হাত ধরে সহায়তা করছিল না।

মজার কথা হলো, আমি আমার সাথের একজন যুবককে মহিলাটির হাত ধরে সাহায্য করতে বললাম। তখন ৪০ বছর যাবৎ বেলজিয়ামে বসবাসকারী আমার ঐ বন্ধুটি বললেন, দোস্ত! এই মহিলাটি এক সময় এই শহরের অন্যতম সুন্দরী হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিল।

পুরুষেরা তার ওপর দৃষ্টি ফেলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। তার সংস্পর্শ পেতে পকেটের অর্থ খরচ করত এবং তার সাথে একবার হলেও করমর্দন করার প্রচেষ্টা চালাত। আজ এই মহিলাটির যখন যৌবন ও সৌন্দর্য চলে গেল, তখন তার হাত ধরে একটু সাহায্য করার জন্য একজন লোকও সে পাচ্ছে না!

এ রকম ঘটনা একটি নয়; শত শত পাওয়া যাবে। কিন্তু তারপরও আমাদের চেতনার বারান্দায় রোদ ওঠে না।

তুমি যখন রাঙাবউ

আজ যে যুবতি, আজ যার রূপসাগরে ডুব দিতে অনেকে নাওয়া খাওয়া বাদ দেয়, সে এক সময় হয় অন্যের ঘরনি, অন্যের রাঙাবউ। আর এর মধ্যেই নারীর প্রকৃত সার্থকতা। এ পর্যায়ে যারা নববধূ হয়ে অন্যের গৃহ আলোকিত করতে গেছে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। তাদেরকে কয়েকটি দরকারি কথা বলতে চাই। আশা করি যারা নববধূ হিসেবে স্বামীর ঘরে যাবে তাদের প্রত্যেকের জন্য কথাগুলো টনিকের কাজ দিবে।

হে নববধূ! তুমি যখন স্বামীর ঘরে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে প্রবেশ করবে। কারণ যে কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা হয়, সে কাজে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। বরং তার সাথে আল্লাহর রহমত সঙ্গী হয়ে থাকে।

স্বামীর ঘরে সর্বদা পাক-সাফ ও পবিত্র পোশাক পরিধান করবে। চোখে সুরমা ব্যবহার করবে। প্রতিটি কাজেই পরিচ্ছন্নতা ও ভদ্রতাবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সবসময় সুগন্ধি ব্যবহার করবে। ঘরের দরজা জানালাসহ সকল কিছু পরিচ্ছন্ন রাখবে। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

শরীর ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে। এতে কর্মস্পৃহা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুস্থ সবল জীবনযাপনের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই। আর যদি তুমি নোংরা, ময়লা আবর্জনাময় পোশাক পরিধান কর, তাহলে রোগ তোমার যেমন সাথি হবে তেমনি সবাই তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখবে।

স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে তাতে সুগন্ধি মেখে যাবে। এতে তোমার প্রতি স্বামীর মায়া-মমতা, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

স্বামীর আনুগত্য করবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহমর্মী হয়ে জীবনযাপন করবে। স্বামীর হক উত্তমরূপে আদায় করে চলবে। মনে রাখবে- ঘরের সকল কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব তোমার। আর বাহিরের সমস্ত কাজের জিম্মাদারি স্বামীর। স্বামী কত কষ্ট করে তোমার ও পরিবারের সকলের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেই তিনি তোমার ও পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার জোটান। তাই তিনি ঘরে আসলে যেন সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে আনন্দের বাগান খুঁজে পান, তোমাকে সেই ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত আমাদের প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার কন্যা রোকেয়া (রা.)-এর পর উম্মে কুলসুম (রা.)-কে ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ দেন তখন তার কন্যাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি মূল্যবান নসিহত করেছিলেন। এ পর্যায়ে তোমার সামনে সেই অমূল্য উপদেশগুলো তুলে ধরছি।

'ঘরের শৃঙ্খলা ও তার তত্ত্বাবধান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ঘরোয়া সব কাজ আঞ্জাম দেয়া যেমন তোমার দায়িত্ব। একইভাবে স্বামীকে সন্তুষ্ট করা, তার কথা মান্য করা, তার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা এবং সন্তানদেরকে আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়াও তোমার কর্তব্য।'

তুমি স্বামীর গৃহে মাটি হয়ে যাবে। তাহলে দেখবে যে, তোমার স্বামী তোমার জন্য আসমান হয়ে থাকবে। তুমি যদি তার আরাম হতে পার, তবে দেখবে তোমার স্বামী তোমার জন্য আরামের ব্যবস্থা করবেন। তুমি যদি তার জন্য দাসী হয়ে যাও তবে স্বামীও তোমার জন্য গোলাম হয়ে যাবে।

তুমি তার নাক, কান ও চক্ষুর প্রতি লক্ষ রাখবে। বিশেষত তার চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করবে। যখনই তোমার সঙ্গ চায় তাৎক্ষণিক তার নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আর মনে রাখবে তিনি যেন তোমার নিকট সুগন্ধি ছাড়া অন্য কোনো গন্ধ না পান; ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু শুনতে না পান; এবং তার পছন্দনীয় বিষয় ছাড়া অন্য কিছু দেখতে না পান।

মনে রাখবে তুমি একদিকে যেমন ঘরের রানি, অন্যদিকে তুমি দাসীও বটে। তোমার স্বামী তোমার মালিক। বিবাহের পর তোমার স্বামীই তোমার মন ও প্রাণের মালিক। তাই সর্বদা আদব-আখলাক ও সদাচরণ দ্বারা তাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করবে। কারণ স্বামীর আনুগত্য নারীর জন্য অতি উচ্চ পর্যায়ের নেকীর কাজ। তুমি যখন অন্যের রাঙাবউ হবে তখন এ কথাগুলো যদি মনে

রেখে সে মোতাবেক জীবন চালাতে পার তাহলে সুখপাখি তোমাকে ছেড়ে কখনও পালিয়ে যাওয়ার কল্পনাই করবে না।

যৌন সুড়সুড়ির ফেরিওয়ালা

আজ বিশ্বব্যাপী চলছে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার পাঁয়তারা। ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করতে হেন কোনো প্রচেষ্টা নেই যা ষড়যন্ত্রকারীরা করছে না। অশ্লীল পত্রিকা, নিকৃষ্ট ম্যাগাজিন, উলঙ্গ সিনেমা, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ইউটিউব, টুইটারে রয়েছে ফাসেক ও পাপিষ্ঠদের প্ররোচনা। সর্বোপরি মুসলিম নারীদেরকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলামের শত্রুরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্তমান মুসলিম নারীর অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে, যা ইসলাম ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে।

গভীর উদ্বেগের সাথে চ্যানেলগুলোতে দেখা যায় যে, একজন যুবক অন্য একজন যুবতি মেয়েকে হাত ধরে নাচাচ্ছে, পরস্পর জড়িয়ে ধরছে, গালে গাল ও বুকে বুক লাগাচ্ছে। টিভির পর্দার সামনে কি সেই মহিলার পিতা-মাতা ও যুবক-যবতি ভাই-বোন থাকে না? এ ধরনের পিতা-মাতা কি তাদের এই নায়িকা মেয়েটিকে চিনতে পারে না? তারা কি মুসলিম নয়? প্রকৃত কোনো মুসলিম কি তার মেয়েকে এ অবস্থায় দেখতে পছন্দ করতে পারে? এই দৃশ্য কি চোখ খুলে দেখতে পারে? তার মেয়েকে নিয়ে অন্য একজন পুরুষ এভাবে খেলা করবে আর সে তা উপভোগ করবে– এটি কোনো মুসলিম কি সমর্থন করতে পারে?

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আজকালকার অধিকাংশ মিডিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যৌন সুড়সুড়ি ফেরি করে থাকে। অবশ্য দুয়েকটি ভালো যে নেই তা নয়। তবে তা শাদা কাকের মতোই বিরল।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন আজকের মিডিয়ার বুদ্ধিজীবী দাবিদার বুদ্ধির ঢেঁকিরা যৌনতা প্রকাশের ঠিকাদারি নিয়েছে কিংবা তারা উলঙ্গপনা প্রকাশের ষোলএজেন্ট। তারা পত্রিকায় বিদেশি অভিনেত্রীদের ছবি প্রকাশ করে। খেলাধুলার নামে স্কুলের ছাত্রীদের অবকাশ যাপনের নামে সমুদ্র সৈকতের নারীদের ছবি ছাপে। তারা দিনের পর দিন এভাবে কাজ করে যাচ্ছে শয়তানি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আর সুনির্দিষ্ট কৌশলেই তারা অগ্রসর হচ্ছে। যদি তারা না থাকত, যদি না থাকত তাদের

পত্রিকা এবং অশ্লীল গল্প ও ছবি! আর যদি না থাকত বিপথগামী বিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষা সমাপনকারী লোকগুলো! তাহলে কতই না ভালো হতো আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য।

যারা একসময় স্কুল-কলেজে আমাদের সন্তানদের শিক্ষার ভার লাভ করে তারা যদি সত্যিকারের আদর্শবাদী শিক্ষক হতো তাহলে কোনো দিনও খেলার নামে, গ্রীষ্মকালীন অবকাশের নামে মুসলিম মেয়েদের পা আর উরু উদাম করা চিত্র দেখতে হতো না। ইসলাম তো দূরের কথা, এমনকি খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের ধর্মও তা সমর্থন করে না। তাদের ইতিহাস পাঠ করলেই এ কথার প্রমাণ মিলে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু মুসলিম দেশে মুসলিম নারী-পুরুষের চারিত্রিক অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, মানুষ তো দূরের কথা; পশুরাও তা গ্রহণ করতে পারে না। এ নির্মম বাস্তবতাকে কি আমরা আজীবন নীরবে সয়েই যাব? এ অধঃপতিত মানবতাকে উদ্ধারের জন্য কি আমাদের কোনো করণীয় নেই?

দুটি মোরগ যখন একটি মুরগীর নিকটবর্তী হয়, তখন মুরগীটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়ার জন্য মোরগ দু'টি পরস্পর ঝগড়া করে এবং একটি অন্যটিকে তাড়িয়ে দেয়।

ইউরোপ, আমেরিকা, ব্রিটেনসহ বিধর্মী রাষ্ট্রের কথা নাইবা বললাম। মুসলিম রাষ্ট্র মিসর, লেবানন বা বাংলাদেশের কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতসমূহে এবং ঢাকার পার্কসমূহে মুসলিম নারীদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাদের মুখ, মাথা, পেট, পিঠ এমনকি সবই উন্মুক্ত। বিকিনি পরে তারা আনন্দে অবগাহন করছে!

শুধু এখানেই শেষ নয়! অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দু'জন পুরুষ মিলে একজন নারীকে ভাগাভাগি করে উপভোগ করছে। এই অবস্থা কি কোনো পশু সমর্থন করে? একটি মোরগ কি চায় যে, তার আয়ত্তের মুরগীটির ওপর আরেকটি মোরগ এসে আরোহণ করুক? অথচ সৃষ্টির সেরা মানুষ কি অবলীলায়ই না এসব পশুত্বকে হার মানাচ্ছে!

আমি এ কথা বলছি না যে, মুসলিম নারীরা এক লাফে প্রথম জমানার মুসলিম নারীদের মতো হয়ে যাবে। কেননা এটি অসম্ভব। কারণ বর্তমানে মুসলিম নারীরা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তা এক লাফে এসে পৌঁছেনি। তারা প্রথমে মাথার চুলের একাংশ খুলেছে, তারপর খোপা, তারপর

পুরোটাই। এরপর বফকার্টিং করে চুল কাটতে শুরু করেছে। আর এখন! এখন তো চুলের দিকে তাকালে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করাই দায় হয়ে পড়বে।

মুসলিম নারীরা অজ্ঞানতার আঁধারে পড়ে তাদের কাপড় ছোট করতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তারা জাতির পুরুষদের গাফিলতির সুযোগে বর্তমানের দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তারা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি যে, বিষয়টি এ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে।

ঘড়ির ঘণ্টা বা মিনিটের কাঁটার দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেটি নড়ছে না; বরং আপন স্থানেই অবস্থান করছে। কিন্তু যদি দু'ঘণ্টা পর পুনরায় সেই ঘড়িটির কাছে ফেরত আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, ঘড়ির কাঁটাদ্বয় এখন আগের স্থানে নেই; বরং অনেক অগ্রসর হয়েছে। এমনিভাবে শিশু জন্মগ্রহণ করে একদিনেই যুবক হয়ে যায় না এবং যুবক হয়ে এক লাফে বৃদ্ধে পরিণত হয় না; বরং দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিক্রম করার মাধ্যমে সে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে। এমনিভাবেই জাতির অবস্থা পরিবর্তন হয় এবং ভালো থেকে মন্দ ও মন্দ থেকে ভালোর দিকে ধাবিত হয়।

এ কারণেই বলছি যে, মুসলিম মেয়েদের এই অবস্থা একদিনেই পরিবর্তন হবে না। এক লাফে তারা পূর্বের সেই আসল অবস্থায়ও ফিরে যাবে না; বরং আমরা সেভাবেই তাদেরকে ধীরে ধীরে পূর্বের অবস্থায় ফেরত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, যেভাবে পর্যায়ক্রমে তারা বর্তমানের করুণ ও দুঃখজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

আমাদের সামনে পথ অনেক দীর্ঘ। পথ যদি অনেক দীর্ঘ হয়, তার বিকল্প সংক্ষিপ্ত অন্য পথ না থাকলে যে ব্যক্তি পথ দীর্ঘের অভিযোগ করে যাত্রা শুরু করবে না, সে কখনো তার গন্তব্যে পৌছাতে সক্ষম হবে না।

প্রেমের রঙিন ফাঁদ

প্রেম-ভালোবাসা আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তবে হ্যাঁ, এখনকার মতো আগেকার প্রেম-ভালোবাসা এতটা নোংরা ছিল না। দিন যতই যাচ্ছে প্রেম-ভালোবাসার নামে নোংরামিও ততই ঘৃণ্য আকার ধারণ করছে। ইদানীং নিষিদ্ধ পল্লিতে গমনকারী খদ্দেরের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলছে।

মিসরের এক যুবক আমার কাছে তার ফ্রেন্ডসার্কেলের এমন দিল কাঁপানো তথ্য দিয়েছে। পাশাপাশি সে এ অবস্থায় করণীয়ও জানতে চেয়েছে। আমি তার জবাবে বলেছি যে, খবরদার, বাবা! সমাজের রঙিন ফাঁদ কিংবা কথিত বন্ধুমহলই হয়তো তোমাকে নিয়ে যাবে এ নরক ভুবনে। তখন তোমার আর ভালো-মন্দের হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না। তুমি আঁজলা ভরে নেবে হারাম প্রবৃত্তির কাদা। এগিয়ে যেতে থাকবে ভ্রান্তির পথে। গমন করবে নিষিদ্ধ পল্লিতে। নিজের দীন-ধর্ম জীবন যৌবন বিলিয়ে দিবে সাময়িক ভোগের পেছনে। তখন অনেক পরিশ্রমের সনদ খোয়াবে। বহু কাঙ্ক্ষিত চাকরি হারাবে। আশা জাগানিয়া বিদ্যা ভুলে যাবে। তোমার শক্তি ও যৌবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এক সময় যা দিয়ে তুমি অবলীলায় কর্মময়তার বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার স্বপ্ন দেখতে তা ক্রমেই তোমার অজান্তে হারিয়ে যাবে। তখন তুমি শুধু ঠুটো জগন্নাথ হয়ে পড়ে থাকবে।

মনে রাখবে যে, নিষিদ্ধ পল্লির ললনারা তোমাকে হয়তো সাময়িক জৈবিক আনন্দ দিবে। কিন্তু তোমার সব হারানোয় সে-ই হবে সবচেয়ে জঘন্য সারথি।

নিষিদ্ধ পল্লিতে একবার গমনে তুমি মনে করবে তৃপ্ত হতে পেরেছ? নাহ! কখনও না। কোনো একজনের সঙ্গে মিলনের পর বাসনা আরও তীব্র হবে। এ যেন লবণাক্ত পানি। যতই পান কর ততই পিপাসা বাড়ে। ওই পাড়ার হাজারজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে যাবে। দেখবে– যে একজন তোমার থেকে দূরে থাকে, যে তোমায় এড়িয়ে চলে; তুমি তার প্রতিই আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাকে না দেখলে তোমার কষ্ট লাগবে। যেমন কষ্ট লাগে যে নারীকে কখনো আবিষ্কার করেনি তার মতো।

মেনে নিলাম যে, তুমি তাদের থেকে যা চেয়েছ তা-ই পেয়েছ। তোমার সম্পদ আছে, ক্ষমতাও আছে। তোমার দেহ কি তা সইতে পারবে? তোমার স্বাস্থ্য কি কামনার সব বোঝা বহন করতে পারবে? এ ক্ষেত্রে বীর বাহাদুরও ধরাশায়ী হয়ে যায়। কতজন শক্তির নায়ক ছিল– ভারোত্তোলন, কুস্তি, তীরনিক্ষেপ ও দৌড় প্রতিযোগিতায় ছিল বিস্ময়! কিন্তু যখনই তারা জৈবিক চাহিদার ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং স্বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তখনই তারা বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞার একটি বিস্ময়কর দিক হলো তিনি উত্তম কাজের প্রতিদান রেখেছেন সাওয়াব, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দিয়ে। পক্ষান্তরে পাপের শাস্তি নির্ধারণ করেছেন অধঃপতন আর অসুস্থতা দিয়ে।

আমার দেখা ত্রিশ বছর পার হয়নি এমন কত পুরুষকে পাপের ঝড়ে মনে হয়েছে ষাট পেরোনো বুড়ো। আবার তার বিপরীত নজিরও আছে। দেখেছি ষাট পার করা কত বুড়োকে। তাদেরকে সংযম আর নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের দরুন ত্রিশ বছরের যুবক মনে হয়। ইউরোপের সেই প্রবাদ আসলেই তার সত্যতা প্রমাণ করেছে– 'তুমি যৌবনের যত্ন নিলে বার্ধক্যে যৌবন তোমার যত্ন নিবে।'

নারীমনের একান্ত চাহিদা

কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য না রাখলে নিজ ঘরে শান্তির দেখা পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ঐ বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথভাবে খেয়াল করলে বৈবাহিক জীবন হয় সুখময়। ভালোবাসার প্রজাপতি আনন্দে পাখনা মেলে উড়াউড়ি করে। প্রত্যেক স্বামীর পক্ষ হতে নিজের স্ত্রীর জন্য এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। নিচে এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

স্ত্রীরা প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ পছন্দ করে। তারা ভালোবাসার সুস্পষ্ট উচ্চারণ শুনতে চায়। অতএব স্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে কার্পণ্য করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে যদি কার্পণ্য করা হয়, তবে তার ও নিজের মধ্যে নির্দয়তার দেয়াল টেনে দেয়া হয়। স্বামী-স্ত্রীর নির্মল ভালোবাসার ব্যাকরণে ভুল করা হয়!

স্ত্রীরা কঠোর ও অনড় স্বভাবের পুরুষদের অপছন্দ করে। পক্ষান্তরে তারা কোমল চিত্তধারী পুরুষদের পছন্দ করে। অতএব প্রতিটি গুণকে স্বস্থানে রাখা অপরিহার্য। কারণ, এটি ভালোবাসা ডেকে আনে এবং প্রশান্তি ত্বরান্বিত করে।

নারীরা স্বামীর কাছে তা-ই প্রত্যাশা করে স্বামীরা স্ত্রীর কাছে যা প্রত্যাশা করে। যেমন- ভদ্রোচিত কথা, সুন্দর চেহারা, পরিচ্ছন্ন বসন ও সুগন্ধি। অতএব প্রতিটি অবস্থায় এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

স্ত্রীকে নিজের মতো করে কাছে পেতে তার কাছে এমন অবস্থায় ঘেঁষা ঠিক নয়, যখন নিজের শরীর থাকে ঘামে জবজবে। কিংবা যখন স্বীয় কাপড় থাকে ময়লা। এমনটি করলে যদিও সে স্বামীর আনুগত্য দেখাবে; কিন্তু তার অন্তরে তার প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা তৈরি হয়ে যাবে। ফলে শুধু তার শরীরই স্বামীর ডাকে সাড়া দিবে; তার অন্তর পালিয়ে বেড়াবে দূরে বহু দূরে।

ঘর হলো নারীর রাজত্ব। ঘরের মধ্যে তারা নিজেকে নিজের আসনে সমাসীন ভাবে। নিজেকে সেখানকার প্রধানতম নেত্রী মনে করে। অতএব তার সাজানো এই প্রশান্তির রাজ্যটিকে তছনছ করতে যাওয়া ঠিক নয়। এ আসন থেকে তাকে নামাবার চেষ্টাও করা প্রয়োজন নেই। তাকে তার আসনে অটুট থাকতে দেয়া উচিত। কারণ এটি মূলত নিজেরই আসন। স্বামী নিজ স্ত্রীকে তার অবস্থানে রাখলে প্রকারান্তরে নিজের আসনই পোক্ত করা হয়। আর যদি তার আসন গুঁড়িয়ে দেয়া হয় তাহলেও প্রকারান্তরে নিজেকেই যেন রাজত্ব থেকে উচ্ছেদ করলে। মনে রাখবেন, কোনো রাজার জন্য তার চেয়ে বড় শত্রু আর কেউ হতে পারে না, যে নিজ রাজত্ব নিয়ে টানাটানি করে।

যদিও স্ত্রী মুখ বুজে সব সয়ে যায় এবং কিছু বলে না; কিন্তু এতে করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়।

নারী যেমন চায় তার স্বামীকে পেতে তেমনি তার পরিবারকেও সে হারাতে চায় না। অতএব তার পরিবারের সঙ্গে নিজেকে এক পাল্লায় মাপতে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। যদি এমন চান যে, সে হয়তো আপনার হবে, নয়তো পরিবারের; তবে সে যদিও আপনাকেই অগ্রাধিকার দেবে। কিন্তু মনে মনে ঠিকই বিষণ্ন হবে। যার ভার সে আপনার দৈনন্দিন জীবন পর্যন্ত বয়ে আনবে।

হাদিসের ভাষ্য মতে, নিশ্চয় নারীকে সবচে বাঁকা হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি তার দোষ নয়; বরং এ তার সৌন্দর্যের এক প্রকার রহস্য। এটি তার আকর্ষণের চাবিকাঠি। ভুর সৌন্দর্য যেমন তার বক্রতায়, নারীর সৌন্দর্যও এমনই।

অতএব সে কোনো ভুল করলে তার ওপর এমন হামলা চালাবেন না যাতে কোনো সহমর্মিতা বা সদয়তা থাকে না। বাঁকাকে বেশি সোজা করতে গেলে আপনি তা ভেঙেই ফেলবেন। তবে হ্যাঁ, তার ভুলগুলো প্রশ্রয় দিবেন না। সেগুলো তাকে বুঝিয়ে বলবেন। তা না করে আপনি তার ওপর শাসনের ছড়ি চালালে তার বক্রতা বেড়েই যাবে। এতে সে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেবে। ফলে সে আপনার জন্য নরম হবে না, আপনার কোনো কথাও শুনবে না। খিটখিটে মেজাজ থেকে ক্রমেই আপনি তার কাছে হয়ে যাবেন তাচ্ছিল্যের পাত্র।

নারীদের সৃষ্টিই করা হয়েছে স্বামীর অকৃতজ্ঞতা এবং উপকার অস্বীকারের উপাদান দিয়ে। যদি যুগ যুগ ধরে তাদের কারো প্রতি সহৃদয়তা ও সদাচার

দেখানো হয় তারপর যদি কালেভদ্রে একটিবার মাত্র তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার হয়ে যায় তবে সে অকপটে বলে ফেলবে- 'তোমার কাছে আমি জীবনে ভালো কিছুই পেলাম না।' অতএব তাদের এ বৈশিষ্ট্য যেন তাকে অপছন্দ বা ঘৃণায় প্ররোচিত না করে। কারণ, আপনার কাছে তার এ বৈশিষ্ট্যটি খারাপ লাগলেও তার অনেক গুণ দেখবেন ভালো লাগার মতো।

নানাবিধ শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক ক্লান্তির মাঝ দিয়ে নারীর জীবন বয়ে চলে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য কিছু ফরজ পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছেন। যা এ সময় কর্তব্য ছিল। যেমন রজঃস্রাব ও সন্তান প্রসবকালে তার জন্য পুরোপুরিভাবে সালাত মাফ করে দিয়েছেন। এ সময় ফরজ সিয়াম পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। যতক্ষণ না তার শারীরিক সুস্থতা ফিরে আসে এবং তার মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতএব এ সময়গুলোয় পুরুষের জন্য আল্লাহর ইবাদতমুখী হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, তার জন্য আল্লাহ যেমন ফরজকে হালকা করে দিয়েছেন তেমনি তার থেকে পুরুষের চাহিদা ও নির্দেশও হালকা করে দেয়া অপরিহার্য।

মনে রাখবেন স্ত্রী কিন্তু আপনার কাছে একজন বন্দিনীর মতো। অতএব তার বন্দিত্বের প্রতি সদয় থাকবেন এবং তার দুর্বলতাগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তাহলে সে হবে আপনার জন্য সর্বোত্তম সম্পদ। সে আপনার সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী হবে। একজন পুরুষের কাছে নারীর এগুলোই প্রধানতম চাহিদা।

ব্যভিচারের পরিণাম

জীবন ও যৌনতা অকাট্য সত্য। এ বাস্তবতাকে ইসলাম অকপটে স্বীকার করে। তবে পাশবিক বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম মানুষের যৌনক্ষমতা ও তার কামনাকে স্বচ্ছ, পবিত্র ও সুশৃঙ্খল করতে চায়। বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে আনার মহান লক্ষ্যেই হয়েছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, চিন্তাচেতনা, স্বভাব-চরিত্র সকল ক্ষেত্রেই তিনি অন্ধকার দূর করে উম্মাহকে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। যে যৌনক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব বংশের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ; সে ক্ষমতা যেন যথার্থ স্থানে প্রবাহিত হয়; অধিকন্তু সে তাড়নায় যেন মানুষ উন্মাদনার শিকার না হয়, সে কারণে যৌন সম্পর্কের কঠোরভাবে প্রতিবিধান করেছে ইসলাম। এক কথায় ইসলাম যৌন চাহিদা পূরণের বৈধ আয়োজনকে উৎসাহিত করেছে।

যেনা-ব্যভিচার ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শিক সকল মাপকাঠিতেই জঘন্য অপরাধ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সকল ধর্ম ও সকল দেশেই এটি অন্যায় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইসলাম এ অপরাধকে সর্বাধিক ঘৃণিত বিবেচনা করে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। *[বনি ইসরাঈল : ৩২]*

ব্যভিচার মানুষকে মর্যাদার আসন থেকে পতিত করে। ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই ইসলাম এর কঠিন শাস্তির বিধান করেছে। এ অপরাধ কাজটি যেমন জঘন্য, শাস্তিও ঠিক তেমনি কঠোর। ব্যভিচারী নারী-পুরুষের একশটি বেত্রাঘাত, অবস্থাভেদে পাথর মেরে প্রাণনাশের শাস্তির বিধান করেছে ইসলামি শরিয়ত। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পাপের উৎসমূল চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া।

অবশ্য এই শাস্তি প্রয়োগ হওয়ার জন্য উপযুক্ত সাক্ষী অথবা স্বীকারোক্তিমূলক স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যাওয়া শর্ত। সাক্ষী কমপক্ষে চারজন হতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। কোথায় কখন কার সাথে কিভাবে যেনা-ব্যভিচার হতে দেখেছে তা পরিষ্কার করে বলতে হবে। 'সুরমাদানির কাঠি সুরমাদানির মধ্যে যেভাবে প্রবিষ্ট করে সেভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছি' এই জাতীয় স্পষ্ট বক্তব্য সকল সাক্ষীকে দিতে হবে। অনুরূপ স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রেও চারবার স্পষ্ট ভাষায় অপরাধের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি দিতে হবে। বিচারক এক্ষেত্রে বরং এইভাবে টলাতে চেষ্টা করবেন, 'তুমি হয়তো ব্যভিচার করোনি। চুমু খেয়েছ, ধরেছ ইত্যাদি। তাতেও যদি না দমে বরং নিজের অপরাধ অকপটে স্বীকার করে তবেই তাকে উপরোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। *[হিদায়া : ২য় খণ্ড, পৃ ৪৮৬]*

কুরআন মাজিদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ... عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে (অপবাদের পক্ষে) অন্য কোনো সাক্ষীও মজুদ থাকে না, তবে এটাই তাদের সাক্ষ্য যে, তারা আল্লাহর নামে চারবার

শপথ করে বলবে, অবশ্যই (এ অভিযোগের ব্যাপারে) সে সত্যবাদী। এরপর পঞ্চমবার শপথ করার সময় বলবে, মিথ্যাবাদীর ওপর যেন আল্লাহ তায়ালার গজব নাযিল হয়। কোনো স্ত্রীর ওপর থেকেও এভাবে আনীত অভিযোগের শাস্তি রহিত করা হবে– যদি সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলে, এ (পুরুষ) ব্যক্তিটি হচ্ছে আসলেই মিথ্যাবাদী। অতঃপর সেও পঞ্চমবার শপথ করার সময় বলবে, সে অভিযোগকারী ব্যক্তিটি সত্যবাদী হলে তার অভিযুক্তের ওপরও আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক। [নূর : ৬-৯]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ..

(অপরদিকে) যারা খামোখা সতী-সাধ্বী নারীদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করবে এবং এর সপক্ষে চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারবে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কেননা এরা হচ্ছে নিকৃষ্ট গুনাহগার। *[সূরা নূর : ৪]*

স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দেয়ার পর শাস্তি কার্যকর হওয়ার পূর্বে যদি বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। শাস্তিটি অত্যন্ত কঠিন বিধায়ই তার বাস্তবায়নে এতটা সতর্কতা ও শর্তসাপেক্ষে তা অবলম্বন করা হয়েছে।

মূলত ইসলামি হুকুমত এসব শাস্তি কার্যকর করবে; কোনো ব্যক্তি নয়। এসব শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, এগুলো সবই আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। এগুলো এমন এক মহান বৈশিষ্ট্য যার পরশে একটি মানুষ এমনিতেই সুস্থ হয়ে যায়। অধিকন্তু যে যৌন শৃঙ্খলার সে শিকার তা চরিতার্থ করার উপযুক্ত পাত্রও তার রয়েছে। এরপরও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। প্রকারান্তরে তা আল্লাহর আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও বিদ্রোহের শামিল। তাই এর শাস্তির বিধান করা হয়েছে অত্যন্ত কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক।

বোরকাওয়ালির রূপ প্রদর্শন

আমরা রোজ সমাজের অশান্তি ও অপরাধগুলো নিয়ে সমালোচনা করি। চিন্তা ও টেনশন করি। নিজেদের সন্তান কোনো দুর্ঘটনার শিকার হোক, অপক্ক বয়সে না বুঝে কোনো খারাপ ছেলের খপ্পরে পড়ুক, বখাটের হাতে ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতা হোক– কেউ তা চাই না। কিন্তু মেয়েদের পোশাক,

উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আর অতি আড়ম্বরপূর্ণ পদচারণা যে এসব ডেকে আনে তা ঘুণাক্ষরেও গুরুত্ব দিয়ে ভাবি না। সাহস করে সে সত্য উচ্চারণ করি না। তাই বদলায় না আমাদের ভাগ্যও। থামে না নির্যাতিতার কান্না। বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে ধর্ষণ আর নির্যাতনের। যার জেরে ঘটে অসহায় মেয়েদের আত্মহত্যা আর আত্মাহুতির ঘটনা।

শালীন পোশাক পরার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। তবে এই শালীন পোশাক পরিধানকারিণীদের প্রতি এক শ্রেণির ভুঁইফোড়ের এলার্জিক্যাল প্রবলেম প্রতিনিয়তই বাড়ছে। মুসলিম নারীদের মধ্যে পর্দা করেন কিংবা বোরকা পরেন এমন নারীর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য নয়। মুসলিম নারীদের অনেকেই আলহামদু লিল্লাহ পর্দা করেন। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে গেলে কিছু বোরকা পরা নারী চোখে না পড়ে থাকে না। এতে সন্দেহ নেই যে, বোরকাপরা নারীকে অন্য যে কোনো পোশাক পরিহিত নারীর চেয়ে শালীন ও সমীহযোগ্য মনে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, তাদের দেখলে এক শ্রেণির অসুস্থ মানসিকতার লোক কপাল কুঁচকায়। অবশ্য এ জাহেল লোকগুলো ছাড়া অন্য সবাই মনে মনে শ্রদ্ধাবোধ করেন।

মুসলিম সমাজে পথেঘাটে বোরকাপরা নারীদের সম্মান দেখানো হয়। গাড়িতে সিট না পেলে বেপরোয়া তরুণরাও তাদের জন্য নিজের আসন ছেড়ে দেয়। যারা সত্যিকার পর্দা করেন রাস্তাঘাটে তাদের পিছু লাগে না বখাটে যুবকরাও। এটিই স্বাভাবিক চিত্র। তবে এই স্বাভাবিক চিত্রের উল্টো পিঠও আজকাল দেখা যায়।

এ যুগের বোরকাপরা মেয়েদের পেছনেও ইদানীং বখাটে ছেলেরা ঘুরঘুর করে। বোরকা হেফাজতের কারণ হওয়ার পরও অনেক বোরকাবৃতা দুর্ঘটনার শিকার হন। গৃহবধূ থেকে নিয়ে স্কুল-কলেজ এমনকি মাদরাসার ছাত্রীরাও সাম্প্রতিককালে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন। তারাও আজকাল খবরের শিরোনাম হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে আসলে স্বতন্ত্রভাবে ভাবা দরকার। আমার মতে, এর অন্যতম কয়েকটি কারণ রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কেই আলোচনার প্রয়াস পাবো ইনশা আল্লাহ।

বিশ্বব্যাপী শালীন পোশাক তথা ইসলামের পর্দা বিধানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, দেশীয় মিডিয়াগুলোয় বোরকাকে নেতিবাচকভাবে বিরামহীন উপস্থাপন, সর্বোপরি কিছু বোরকাধারীর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণহেতু দিনদিন বোরকার প্রতি এক শ্রেণির মানুষের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠছে। মিডিয়ার বিষয়টি

বাদ দিলে তথাকথিত এই বোরকাওয়ালীদের আচরণই মূলত দায়ী। অনেক সময় দেখা যায় অনেক যুবতি বোরকা পরে বটে; কিন্তু তার চাকচিক্য এমন হয় যে, বোরকা পরেই সে অন্যকে বেশি আকৃষ্ট করে।

আল্লাহ তায়ালা পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে নারীরা তাদের সৌন্দর্যকে গোপন করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। কিন্তু পর্দা যদি এমন সুন্দর হয়, যা দেখে পুরুষরা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ফেতনার মুখোমুখি হয়, তাহলে এ ধরনের পর্দার কোনো অর্থ হতে পারে না। কারণ, এ ধরনের কাপড় ছাড়া পর্দা বাস্তবায়ন হবে না। কেননা, চিকন ও পাতলা কাপড় পরিধান করলে বাস্তবে মহিলারা উলঙ্গই থেকে যায়।

ইদানীং এমন কিছু হিজাব বা বোরকা বের হয়েছে, যার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য ঢেকে রাখার জন্য আরেকটি হিজাবের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ধরনের হিজাব পরার দ্বারা নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ আরো বেড়ে গিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

سَيَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ أُمَّتِيْ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, عَلٰى رُؤُوْسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ, اَلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ.

আমার আখেরি জামানার উম্মতদের মধ্যে এমন কতক নারীর আবির্ভাব হবে, যারা পোশাক পরিধান করলেও মূলত তারা উলঙ্গ। তাদের মাথা উটের চোটের মতো উঁচু হবে। তোমরা তাদের অভিশাপ কর। কারণ, তারা অভিশপ্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন–

لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

> তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে। *[মুসলিম শরীফ]*

সম্প্রতি একটি শ্রেণি বোরকাবিরোধী কটুবাক্য উচ্চারণে অভ্যস্ত। এদের কারণে অনেক সময় প্রকৃত পর্দানশীল নারীদেরও দুষ্টলোকের অশিষ্ট মন্তব্য হজম করতে হয়। নিজের মতো বোরকাপরা একটি মেয়েকে নষ্টামি করতে দেখে কে না লজ্জায় অধোবদন হন! মানুষের সামনে আড়ষ্ট হয়ে ভেতরে হায় হায় করেন।

এখন শহরের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বলতেই এমন কিছু ব্যাপার সেখানে ডালভাত। বিশ্বের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের হোটেল রেস্তোরাঁয় অশ্লীল পোশাকপরা মেয়েদের মতো বোরকাপরা কিছু শালীন পোশাকধারীকেও দেখা যায় বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে অবলীলায় আড্ডা দিতে। আবার অনেককে বেগানা পুরুষের সঙ্গে স্বামীর মতো করে গা ঘেঁষে বিচরণ করতেও দেখা দেয়।

সার্ভিস বাসগুলোয় অন্য তরুণ-তরুণীর তো বটেই বোরকাপরা কোনো মেয়েকে পেছনের সিটে বসে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখলে আর কষ্টের অন্ত থাকে না। মুসলিম মেয়েদের আঁটসাঁট পোশাক আর অশ্লীলতার নির্লজ্জ প্রদর্শনীর জ্বালায় যখন পথে বেরুনো দায় তখন এই গুটিকয় বোরকাধারীর এসব আচরণ আরো অসহ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ইদানীং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে কিংবা শহরের কোনো পার্ক বা রেস্টুরেন্টে গেলে যে কারো চোখে পড়বে বোকরাবৃতা মেয়েদের অসংলগ্ন আচরণ। যানবাহন আর পার্কে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত বাপের টাকায় পড়তে আসা ছাত্রীদের দেখা যায় বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সত্যিকার পর্দাকারিণী এবং ইসলাম অন্তঃপ্রাণ বলতেই তাদের এসব অসভ্য ও ইসলামি শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ড দেখে বিস্মিত ও ব্যথিত হন। তাদের নিয়ে যখন মানুষ বিরূপ মন্তব্য করে তখন নিলাজ তারা হয়তো শুনতে পান না কিংবা শুনলেও তাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না।কিন্তু ইসলামপ্রেমী অন্য যারা এসব খারাপ মন্তব্য করতে শোনেন, তারা ঠিকই বিব্রতবোধ করেন। প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত হন।

আবার কাউকে দেখা যায় বোরকা পরেছেন তো তার মুখ খোলা। উপরন্তু মুখমণ্ডলে মেকআপ আর রঙের ছড়াছড়ি। ঠোঁটে কড়া লিপস্টিকের দৃষ্টিকটু কারুকাজ। বোরকাওয়ালির এহেন রূপ প্রদর্শন ইসলামের জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

আরেক শ্রেণির নারী জিন্স প্যান্ট আর টাইট গেঞ্জি পরে। কিন্তু মাথা আবৃত রাখে ফ্যাশনেবল স্কার্ফ দিয়ে। শরীরের গঠন তাতে কেবল সুদৃশ্যমানই হয়ে ওঠে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পুরুষকে আর দশজন বেপর্দা নারীর চেয়ে বরং বেশিই আকর্ষণ করে। আরেকটি শ্রেণি আছে যারা বোরকা পরে মুখও ঢাকে ঠিক; কিন্তু সেই বোরকা আর স্কার্ফ এতোটাই পাতলা যে, তাতে আবৃত দেহের আকার-আকৃতি অক্লেশেই পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে।

ইদানীং অনেক মা-বোনকে দেখা যায়, বোরকা পরে কিংবা মাথায় হিজাব লাগিয়ে নিজের মেয়েকে অর্ধনগ্ন পোশাকে সুন্দরী প্রতিযোগিতা কিংবা নাচ, গান কিংবা সুন্দরী বিচিত্র দেহ প্রদর্শনীমূলক প্রতিযোগিতায় নিয়ে যান। আর এসব প্রতিযোগিতায় নিজের মেয়েকে খেতাবধারী বানাতে ছোটবেলা থেকেই নিয়ে যান গান বা নাচের স্কুলে। মুসলিম হিসেবে শুদ্ধভাবে কুরআন শেখার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সন্তানকে তা শেখাতে যারা যত্নশীল নন, বিস্ময়করভাবে তারাই কি-না দু'দিনের যশ-খ্যাতি কামাতে নাচ-গানে এতো আন্তরিক!

এ পর্যায়ে একটি ব্যাপার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাহলো, যারা বোরকা পরা সেসব নারীর সমালোচনা না করে বোরকাকে সমালোচনায় বিদ্ধ করেন, তাদেরও একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত যে, কিছু দুষ্ট প্রকৃতির নারী তাদের অপকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পাদনের জন্য বোরকা ব্যবহার করেন। আবাসিক বোর্ডিং কিংবা ছিনতাই বা চুরি-ডাকাতির ক্ষেত্রে, মাদক পাচারকালেও এর আশ্রয় নেয় অনেক দুষ্ট লোক। হতভাগা কিছু নারী পরীক্ষায় নকলের জন্যও বোরকাকে কলংকিত করে। এদের বিচার তো আল্লাহই করবেন। এ জন্য ঢালাওভাবে বোরকাকে দোষারোপ করা বা ধর্মদ্রোহীদের ভাষায় বোরকাবৃতাদের দোষ খুঁজে বেড়ানো আর যাই হোক কোনো ঈমানদারির পরিচয় হতে পারে না; হতে পারে না কোনো ভদ্রলোকের আচরণও। এদের অপকর্মকে যদি কেউ বোরকা না পরার যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন তবে তিনি অজ্ঞতা কিংবা ধর্মদ্রোহিতার পরিচয় দেবেন। মনে রাখতে হবে যে, কিছু লোকের অপকর্মের ভার কখনো কোনো শ্রেণির ওপর চাপানো সুবিবেচনা হতে পারে না। এটি অবশ্যই জঘন্য অন্যায়।

বোরকার মুণ্ডুপাত

একটি বিষয় আজ সমাজদেহকে বিষিয়ে তুলছে। তাহলো, সারা পৃথিবীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের মিডিয়াগুলোও তো বর্ণবাদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। রোজ পেপারে গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণবাদী ঘটনার বিবরণে একে অপরাধ হিসেবে তুলে ধরা হয়। তথাপি তারা আবার কিভাবে বর্ণবাদী আচরণ করে ইসলাম অনুশীলনকারীদের প্রতি? সন্দেহ নেই যে, ইসলামি পোশাকের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও এক ধরনের বর্ণবাদী মানসিকতার পরিচায়ক। কেউ যদি উল্টো যুক্তি দিয়ে বলে যে, তারা নিজেরা যে সাধারণ পোশাক পরেন, দুনিয়ার সব অপরাধী আর সন্ত্রাসী বদমাশই তো সে পোশাকে শোভিত হয়!

তাই বলে কি প্যান্ট-শার্ট পরা দেখলেই তাকে কেউ বলতে পারে সন্ত্রাসী, দুষ্কৃতকারী? বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা আর ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ফুলপ্যান্ট আর টি শার্ট বা কোর্ট-টাই পরেন বলে আমি কি এ পোশাকে কাউকে দেখলেই বলতে পারি যে, এই হিটলার, মুসোলিনি? কখনো না। তাহলে বোরকাপরা কোনো নারীকে কিংবা অপরাধ সংঘটনের জন্যই বোরকাপরা পুরুষকে কাব্যাঘাত না করে কেন মুণ্ডপাত করা হবে বোরকার? এ এক অবিচারই বটে।

তবে বোরকাপরা বোনদেরও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামবিরোধী মিডিয়াগুলো সব সময় এসব খারাপ দৃষ্টান্ত লুফে নেয়ার অপেক্ষায় থাকে। তারা টুপি-দাড়ি বা বোরকাপরা মানুষের কোনো দোষ পেলে দায়ী ব্যক্তির অপরাধের সমালোচনা না করে এই পোশাকের বিরুদ্ধে ওঠেপড়ে লেগে যায়। আসলে এই ছুতোয় তারা নিজেদের ইসলাম না মানার কুবাসনা চরিতার্থ করে। নিজের ধর্মহীনতাকে জায়েয করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় ষোলকলা পাকাপোক্ত করে।

বোরকার প্রমাণ দিতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন–

كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَابِ يَعْنِي عَلَى مَا كان يتعاطاه نِسَاءُ الْعَرَبِ مِنَ
الْمِقْنَعَةِ الَّتِي تُجَلِّلُ ثِيَابَهَا وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلِ الثِّيَابِ. فَلَا حَرَجَ
عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه

চাদর ও কাপড়। আরবের নারীগণ যে বড় চাদরে তাদের পরনের কাপড় ঢেকে বের হতেন এবং কাপড়ের নিচের অংশ, যা চলার সময় চাদরের নিচ দিয়ে প্রকাশিত হয়ে যেত, তা যেহেতু ঢেকে রাখা সম্ভব নয় সেহেতু এতে কোনো দোষ নেই। *[ইবনে কাসীর : ৬/৪১]*

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ
إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গায়ে জাফরান ব্যবহৃত একজোড়া কাপড় দেখে বললেন, 'এসব হলো কাফেরদের পোশাক। তাই তুমি তা পরিধান করো না।' *[মুসলিম : ৫৫৫৫]*

সমাজদেহ থেকে এই অভিযোগ ও সমালোচনার মূলোৎপাটন জরুরি। সেজন্য বোরকাপরা নারীদের প্রয়োজন দায়িত্বশীল আচরণ। কারণ প্রকৃত বোরকাবৃতা মা বোনেরা কিছুতেই নিজের মর্যাদা ও সম্মানের কথা ভুলতে পারেন না। তাদের জানতে হবে কোন কাজটি তাদের সম্মানের সঙ্গে যায় আর কোনটি যায় না। শুধু সামাজিকতা রক্ষায় কিংবা বাবা-মা'র পীড়াপীড়িতে নয়, সকল নারীকে বোরকা পরতে তথা শালীন পোশাক পরতে হবে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জেনে এবং বিধানটিকে বুঝে। বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ বোরকা নয়; তাঁর নির্দেশ হলো পর্দা রক্ষা করা। তাই প্রয়োজন আপাদমস্তক নিজেকে ঢেকে ফেলা এবং বেগানা পুরুষের সংশ্রব থেকে যথাসাধ্য দূরত্ব বজায় রাখা। মনে রাখতে হবে যে, পরিবারের নিরাপদ ছায়াই নারীর ঠিকানা।

ইদানীং এ বিষয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মাঝেমধ্যেই বিতর্ক তোলা হচ্ছে। আসলে এ বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। তবে হ্যাঁ, এ জন্য অভিভাবকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। সন্তানকে আর সব শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক শিক্ষাও দিতে হবে। পর্দা এবং ইসলামের শিষ্টাচার শেখাতে হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। পাশাপাশি তাদের জন্য পরিবারে নিশ্চিত করতে হবে ইসলামি অনুশাসন এবং সঠিক গৃহশিক্ষার। নিজের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দিয়ে কলিজার টুকরো মেয়েকে বিধর্মী পোশাক কিংবা পুরুষদের বেশ কিনে দেবেন না। সন্তানকে বানাবেন না আল্লাহর রাসূলের অভিশাপের ভাগিদার। দায়িত্বশীল হিসেবে নিজেকেও বানাবেন না অপরাধী।

চাঁদ কপালে তিলক রেখা

কপালে তিলক পরাটা কোনো কোনো নারী ফ্যাশন মনে করে থাকে। বিশেষত যুবতি, তরুণীদের মাঝে এর প্রকোপ অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা চলে যে, কপালে সিঁদুর বা তিলক পরা বিধর্মী বিবাহিত নারীর সংস্কৃতি বা প্রতীক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক মুসলমান নারীর মধ্যেও কপালে তিলক পরার ব্যাধি আছে। তারা ভেবে থাকে যে, কপালে তিলক না দিলে জাতে ওঠা যায় না। এটা যেন গর্বের প্রতীক তাদের।

আজকাল নানা রঙের তিলক বাজারে পাওয়া যায়। মেয়েদের গায়ের শাড়ি কিংবা অন্যান্য পোশাকের সাথে ম্যাচিং (Maiching) করে তারপর তিলক

ব্যবহার করে। অথচ এটা বেদীনদের ধর্মীয় রীতির অনুসরণ। সে কারণে এটা সম্পূর্ণ হারাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

কথিত রূপপূজারী ফ্যাশনবাদী নারীদের মনে সংশয় জাগে, এই চাঁদনিমুখে কারো কুদৃষ্টি পড়বে না তো! তাই তারা 'বদ-নজর' থেকে রক্ষার জন্যে চেহারায় একখানা 'তিলকচিহ্ন' বসিয়ে দেয়। এই তিলক চিহ্নের নামই 'বিউটি স্পট'। এই তিলকচিহ্ন নাকি সৌন্দর্যকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। বাহ! কী চমৎকার আয়োজন। সৌন্দর্যও বাড়াল আবার কুকৃদৃষ্টিকেও প্রতিহত করল।

পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা কি ঘুণাক্ষরেও ভেবে দেখেছি যে, এই কি মুসলিম নারীর জীবন? তুচ্ছ এই দু'দিনের পান্থশালা! যেসব মুসলিম নারী দিবানিশি সৌন্দর্যচর্চায় নিমজ্জিত– তারা যেন মনেই করতে পারে না যে, নামাজ-রোযাও তার কাজ। তারা ভেবেই দেখে না যে, তাকে এই জীবন ও অর্পিত কর্তব্য সম্পর্কে একদা জবাবদিহি করতে হবে হরফে হরফে।

তাছাড়া যারা সৌন্দর্যের তিলক এঁকে পথে–প্রান্তরে, পার্কে, মার্কেটে ঘুরে বেড়ায় আর তাদের প্রতি হাজার বছরের রূপতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে রূপপাগল যে পুরুষের দল; তাদের উভয় শ্রেণি সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন এভাবে–

لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ

> 'ঘুরে ঘুরে রূপদর্শনকারী পুরুষ আর রূপ প্রদর্শনকারী নারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লানত হোক।' *[গাযযুল বাছার : ১৫ পৃ.]*

আমেরিকার এক বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ তার দীর্ঘজীবনের গবেষণায় বলেন, যে কোনো কেমিক্যাল জাতীয় রং শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষত স্পর্শকাতর কোনো স্থানে যদি এ জাতীয় রঙের ব্যবহার হয় তবে এর শরীরে চর্ম জাতীয় রোগ বাসা বাঁধে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সারের মতো বড় ধরনের রোগও হয়ে থাকে।

মেয়েরা কপালে সাধারণত যে তিলক ব্যবহার করে থাকে তা অনেক কেমিক্যালযুক্ত বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ। আর কপাল হলো মুখের একটা অংশ এবং মুখ হলো শরীরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর স্থান। এটি নারীর সৌন্দর্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং কেউ যদি কপালে সর্বদা তিলক ব্যবহার করে আর এটি যদি তার ত্বকের সাথে এগজাস্ট না হয় তবে এলার্জিসহ যে কোনো চর্ম রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগও তার মুখে, কপালে বাসা বাঁধতে পারে।

বিশেষত ৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি বেশি আশঙ্কা হয়ে থাকে। আমাদের উচিত যথাসম্ভব এ জাতীয় কেমিক্যাল শরীরে ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

আমি ঠিক তো জগৎ ঠিক

নীতিবাক্য আওড়ানো কিংবা অন্যকে উপদেশ দেয়ার মতো সহজ কাজ পৃথিবীতে কমই আছে। আমরা পুরুষরা নারীদের সমালোচনা করি। কিন্তু নিজের সমালোচনা কেউ করলে তা পছন্দ করি না। মূলত ইসলামি ফরজ বিধানগুলো নারী-পুরুষ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ইসলামের সুমহান আদর্শের হাতছানি। ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর ধর্মীয় বিধানাবলি পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। শারীরিক গঠন ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় বিধানাবলি কোনো কোনো সময় শিথিলযোগ্য। এছাড়া সর্বদা নারী ও পুরুষ উভয়কেই ইসলামের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে এমনটিই সত্য।

যদি কোনো নারী অথবা পুরুষ ওই বিধানাবলি লঙ্ঘন করে, তাহলে তাকে শাস্তিভোগ করতে হবে। যা স্পষ্ট করে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিধানাবলির ব্যাখ্যা একচোখা নীতিতে বিশ্লেষণ করে নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। যা মোটেই সমীচীন নয়। নিজে ঠিক না হয়ে অন্যকে উপদেশবার্তা শোনানোকে কুরআন মাজিদে মুনাফিকের লক্ষণ বলা হয়েছে। আমি মনে করি, আমি ঠিক তো জগৎ ঠিক। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজের ভুল নিজে বোঝা।

ধর্মীয় গোঁড়ামি, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কারণে নারীদের পুরুষের চাপিয়ে দেয়া অনেক বিধানের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়। যদিও শরিয়তের ওই বিধানাবলি পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। ইসলামের এমনই একটি অবশ্য পালনীয় বিধান হলো পর্দা। যা নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর আরোপিত

হয়েছে। কিন্তু যুগে যুগে এই পর্দাপ্রথা শুধু নারীর ওপর কঠোরভাবে আরোপের কারণেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এ প্রথাকে নারীর জন্য কারাগার বলতে সুযোগ পেয়েছে।

এ কথা ঠিক যে, সমসাময়িককালে এ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তবে এ কথাও সত্য যে, আজও অবৈধ পর্দা প্রথার বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের অনুসারী সব নারী ইসলামের দেয়া স্বাধীনতার স্বাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেনি। আর আজো পুরুষের ওপর যে পর্দা ফরয করা হয়েছে, সে বিষয়টি অধিকাংশ পুরুষের অগোচরে রয়ে গেছে। ফলে অনেকে মনে করে থাকে যে, পর্দাপ্রথা শুধু নারীর জন্য; পুরুষের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এমন ধারণা ডাহা মিথ্যা ও সত্যের অপলাপ।

কুরআন মাজিদে নারীর পাশাপাশি পুরুষকেও পর্দা পালন করার জন্য কঠোরভাবে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى

তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্যে আমি পোশাক দিয়েছি। তাকওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট। *[সূরা আরাফ : ২৬]*

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর নির্দেশদান করেছেন যে, কোনো নারী অথবা পুরুষ যেন কোনোভাবেই পর্দা লঙ্ঘন না করে। তিনি বলেন, যে আপন ভাইয়ের সতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অভিশপ্ত। [জাসসাস : আহকামুল কুরআন]

এক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের সামনে এবং কোনো নারী কোনো নারীর সামনেও উলঙ্গ হতে পারবে না। সিহাহ সিত্তাহ হাদিসগ্রন্থের অন্যতম মুসলিম শরিফে বলা হয়েছে যে, কোনো পুরুষ কোনো পুরুষকে এবং কোনো নারী কোনো নারীকে যেন উলঙ্গ অবস্থায় না দেখে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণীটি দ্বারা এ বিষয় স্পষ্ট যে, শুধু পুরুষের সামনে নারী পর্দা করবে তা নয়; বরং নারীর সামনে পুরুষও পর্দা করবে।

উপরন্তু নারীর সামনে নারী এবং পুরুষের সামনে পুরুষের পর্দা করাও ধর্মীয় বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত। এসব নির্দেশনার পাশাপাশি পুরুষের জন্য স্পষ্টভাবে পর্দার কথা বলা হয়েছে। শারীরিক গঠন বিবেচনা করে এই নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পুরুষের জন্য শরীরের নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ঢেকে রাখার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজের উরু কাউকে দেখাবে না এবং কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির উরুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। [তাফসিরে কবীর]

উপরোক্ত নির্দেশগুলো সর্বজনীন নির্দেশ। এই নির্দেশ নারীর পাশাপাশি পুরুষের ক্ষেত্রেও সমানভাবে পালনীয়।

চোখ যে মনের কথা বলে

চোখেরও ভাষা আছে। আজকের বিশ্বে চোখের ভাষার খুব কদর করা হয়। চোখের ভাষাটাই হলো দৃষ্টি। এই দৃষ্টি সকল অন্যায়ের মূল। দৃষ্টির মধ্যে এক জাদুকরি প্রভাব থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ যে চোখের ভাষা বোঝার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তা মূলত দৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই। এই কিছুকাল আগেও কথিত আধুনিক পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের চিন্তাধারা ছিল যে, কারো প্রতি তাকালে আর কী হবে? এটাতো শুধু দেখা, কোনো ভুল বা অন্যায় কাজ তো নয়! তাদের মতে, এতে ক্ষতির কিছুই নেই। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এখন বিজ্ঞান বলছে, দৃষ্টির প্রভাব মানবজীবনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا..

হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। *[সূরা নূর : ৩০]*

আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ..

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। *[সূরা নূর : ৩১]*

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ إِلَيْهِ.

'ঘুরে ঘুরে রূপদর্শনকারী পুরুষ আর রূপ প্রদর্শনকারী নারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লানত হোক।' *[গাযযুল বাছার : ১৫ পৃ.]*

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, দৃষ্টির মাঝে মানুষের এমন এক শক্তি থাকে যার দ্বারা অন্যের দেহের বড় ধরনের ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারে এবং হয়েও থাকে। দৃষ্টি যে কোনো সুন্দর জিনিসকে অসুন্দরে পরিণত করতে পারে। বিশেষত নারীর ক্ষেত্রে কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর প্রতি ঐ সম্মোহনী শক্তির বলে তাকায় তাহলে ঐ নারীর রূপের যৌবন এমনকি দেহের ওপর পর্যন্ত এর প্রভাব পড়ে।

আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে, কেউ যদি তার সামনে হঠাৎ একটি বাঘ দেখতে পায়, তাহলে তার দেহ ও প্রাণের মধ্যে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়? আবার এটাও সত্য যে, কোনো সুস্বাদু খাবার দেখলে অটোমেটিক মনের মধ্যে এক ধরনের ভালো লাগা জাগ্রত হয়। এটি অবশ্যই দৃষ্টি ও নজরের প্রভাব বৈ আর কী হবে!

চোখ বা দৃষ্টির ফলেই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থকে। তাই দৃষ্টি হলো অপরাধের মাতৃসদন। ইসলাম নারীকে যেমন তার দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি পুরুষকেও সতর্ক করেছে তার দৃষ্টি হেফাজত করতে।

এ কারণে পুরুষদের দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ করা হয়েছে। এটি নারীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অপরিচিত নারীর রূপ ও সৌন্দর্য শোভা দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করা পুরুষের জন্য অনাচার সৃষ্টিকারী। আর অনাচার বিপর্যয়ের সূচনা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবে দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে হয়। এজন্য সর্বপ্রথম এই পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ইসলামে নারী এবং পুরুষ উভয়ের দৃষ্টি হেফাজতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্য হতে একটি তীর। *[তাবারানী]*

অন্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দৃষ্টির হেফাজত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে। *[বুখারি শরীফ]*

প্রশ্ন হতে পারে যে, চোখ খুলে দুনিয়ায় বসবাস করতে গেলে সব কিছুর ওপরেই দৃষ্টি পতিত হবে। আর কবির ভাষায় যদি কেউ বলে– 'তুমি সুন্দর! তাই চেয়ে থাকি, সে কি মোর অপরাধ!' বাস্তবিকপক্ষে উপরোক্ত উক্তি কবির দৃষ্টিতে কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেও ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ হিসেবে গণ্য। তবে হ্যাঁ, কারো মনে যদি এমন প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, বর্তমান বিশ্বে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের এমন বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোনো পুরুষ কোনো পরনারীকে দেখবে না এবং কোনো নারী কোনো পরপুরুষকে দেখবে না, এটি অসম্ভব। কারণ পথেঘাটে চলতে-ফিরতে, চাকরি করতে নারী-পুরুষের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে– এটাই স্বাভাবিক।

আমরাও উপরোক্ত ভদ্র মহোদয়দের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলতে চাই যে, ইসলাম এমনটিই চেয়েছে যে, নারীরা বন্দিজীবন থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করুক। তবে সেটা হতে হবে অবশ্যই পর্দা মেনে। অর্থাৎ পথেঘাটে চলতে ফিরতে নারীর ওপর পুরুষের অথবা পুরুষের ওপর নারীর দৃষ্টি পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তবে সেই দৃষ্টি বিনিময় বারবার ঘটা অস্বাভাবিক। যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, কোনো নারীর ওপর হঠাৎ করে কোনো পুরুষের দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে তিনি তাৎক্ষণিক দৃষ্টি সংযত করবেন এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কেয়ামতের দিন তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লৌহ ঢেলে দেয়া হবে। *[ফাতহুল কাদীর]*

ইসলাম গোঁড়ামির ধর্ম নয়। তাই একান্ত প্রয়োজনে পর্দার বিধান কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে। যেমন- ডাক্তার রোগীকে দেখার স্বার্থে শুধু তার মুখমণ্ডল নয়, প্রয়োজন হলে সতরও দেখতে পারবে। এছাড়া বিয়ে করার সময়, বৃদ্ধ, রুগ্ণ ব্যক্তি ও বালকের জন্য পর্দা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মনে রাখবেন, যদি নারী-পুরুষ উভয়ই ইসলামের পর্দার বিধানাবলি যথাযথভাবে পালন করে তাহলে সর্বত্র নারী নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে। আর পুরুষের ওপর অর্পিত পর্দার বিধানাবলি যদি পুরুষরা যথাযথভাবে মেনে চলে তাহলে নারীকে পর্দা প্রথার নামে ঘরে বন্দি করে রাখার প্রয়োজন হবে না। সত্যিকার অর্থে যদি এমনটি সম্ভব হয়, তাহলে সমাজে অনাচার-ব্যভিচার, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আলোচিত ইভটিজিংয়ের জন্য আলাদা কোনো আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা থাকবে

না। কারণ ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে পুরুষ পথেঘাটে এবং কর্মক্ষেত্রে দৃষ্টি সংযত রেখে চলাফেরা করবে। এমনটি যদি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে নারী নিরাপদ থাকবে। বস্তুত পুরুষ যদি তার দৃষ্টি হেফাজত করে, তাহলে এ কথা অচিরেই সত্যি হয়ে উঠবে যে, পুরুষের পর্দায় নিরাপদ নারী। একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, নারীদের পাশাপাশি পুরুষরাও পর্দা মেনে চলেছে।

ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর ধর্মীয় বিধানাবলি পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিশেষ করে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অজ্ঞতা, কুসংস্কারের কারণে পুরুষের চাপিয়ে দেয়া অনেক বিধানাবলির যাঁতাকলে নারীদের পিষ্ট হতে হয়। যদিও শরিয়তের ওই বিধানাবলি পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। এমনই একটি অবশ্য পালনীয় ইসলামের বিধান হলো দৃষ্টির হেফাজত। যা নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর আরোপিত হয়েছে।

অন্যদিকে আজো পুরুষের ওপর যে পর্দা ফরজ করা হয়েছে, সে বিষয়টি অনেক পুরুষের অগোচরে রয়ে গেছে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার ও যৌন হয়রানির মতো ভয়াবহ অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে– 'হে মানবসন্তান! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শরীর আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন। এটি তোমাদের শোভাবর্ধক।' *[আল আরাফ : ২৬]*

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী শরীর আবৃত করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্যই ফরজ করা হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কড়া নির্দেশদান করেছেন, কোনো নারী অথবা পুরুষ যেই হোন না কেন তিনি যেন কোনোভাবেই পর্দা লঙ্ঘন না করেন। তিনি বলেন, 'যে আপন ভাইয়ের সতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অভিশপ্ত।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণীটি দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, শুধু পুরুষের সামনে নারী দৃষ্টির হেফাজত করবে, তা নয়; বরং নারীর সামনে পুরুষও দৃষ্টি হেফাজত করবে। উপরন্তু নারীর সামনে নারী এবং পুরুষের সামনে পুরুষ পর্দা করতে বাধ্য হবে।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে– 'যখন তোমাদের পুত্ররা সাবালক হবে, তখন অনুমতি সহকারে গৃহে প্রবেশ করা তাদের উচিত। যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা অনুমতি সহকারে গৃহে প্রবেশ করত। *[সূরা নূর : ৫৯]*

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– হে ঈমানদাররা! গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে প্রবেশ করবে না এবং যখন প্রবেশ করবে তখন গৃহের অধিবাসীদের সালাম দাও। *[সূরা নূর : ২৭]*

বস্তুত গৃহের ভেতরে ও বাইরের মধ্যে একটা বাধা-নিষেধ স্থাপন করাই ওই আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে ওই আয়াতদ্বয় দ্বারা পারিবারিক বলয়ে নারীকে পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরেকটি কথা না বললেই নয় যে, এর মাধ্যমে পুরুষকে পর্দা করার কথা বলা হয়েছে।

এ কারণেই কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا..

'হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয় তারা যা কিছুই করে, আল্লাহ তৎসম্পর্কে পরিজ্ঞাত। *[সূরা নূর : ৩০]*

এ আয়াত দ্বারা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ পুরুষদের দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ করেছেন। এটা নারীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আর পুরুষ যদি তার দৃষ্টি সংযত রাখে তাহলে নারী তেঁতুল নাকি মরিচ, সে বিষয়টি অনুভব করার সুযোগ একেবারেই থাকে না।

সমান অধিকার

আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেকের মধ্যেই এমন উপাদান যুক্ত করা হয়েছে। যার কারণে একজন অন্যজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। সুতরাং কেউই এমনকি পৃথিবীর সকল মানুষ মিলে চেষ্টা করলেও আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করতে পারবে না। কখনোই নারী-পুরুষের ব্যবধান উঠিয়ে দিয়ে উভয়কে সমান করতে পারবে না এবং নারী-পুরুষের পরস্পরের দিকে আকর্ষণকে ঠেকাতে পারবে না।

যারা সভ্যতার নামে নারী-পুরুষের মধ্যকার ব্যবধান উঠিয়ে দিতে চায় এবং উভয় শ্রেণির জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে কর্মক্ষেত্রে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায় তারা মিথ্যুক। তাদের মতলব খারাপ। কারণ

এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মনের চাহিদা মেটাতে চায় এবং অন্যের স্ত্রী-কন্যাকে পাশে বসিয়ে নারীদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চায়। সেই সাথে আরো কিছু করার সুযোগ পেলে তাও করতে চায়। কিন্তু এ কথাটি এখনও তারা খোলাসা করে বলার সাহস পাচ্ছে না।

নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, সভ্যতা ও উন্নয়নের যে সুর তুলছে তা নিছক সস্তা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সমস্ত কথার পিছনে তাহজীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা, উন্নতি অর্জন আদৌ তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং তা চরম ভাওতাবাজি।

সমঅধিকার দাবিদাররা যে মিথ্যুক তার আরেকটি কারণ হলো, যে ইউরোপ-আমেরিকাকে তারা নিজেদের আদর্শ মনে করে এবং যাদেরকে তারা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পথপ্রদর্শক মনে করে মূলত তারা প্রকৃত উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা যেটিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করছে, তা মূলত সত্য ও সভ্যতা নয়; বরং সেটি হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত অশ্লীল সভ্যতা। তাদের ধারণায় নাচ, গান, বেহায়াপনা, উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ হওয়া, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষায় অংশ নেয়া, নারীদের খেলার মাঠে নামা এবং সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে গোসল করাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড। আর প্রাচ্যের দেশ তথা মুসলিমদের মসজিদ-মাদরাসা, মদিনা, দামেশক এবং আল-আজহার বিদ্যালয়সহ সকল ইসলামি প্রতিষ্ঠানে যে উন্নত চরিত্র, সুশিক্ষা, নারী-পুরুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাদের ধারণায় তা মুসলিমদের পশ্চাৎমুখী হওয়ার এবং সভ্যতাও সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ।

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ঘুরে আসা বা সেখানে বসবাসকারী অসংখ্য পরিবার নারী-পুরুষের খোলামেলা চলাফেরাতে সন্তুষ্ট নয় এবং এটি তাদেরকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজ তারা বিকল্পের সন্ধানে ফিরছে।

সৃষ্টিগতভাবেই নারী ও পুরুষ এক নয়। তাদের প্রত্যেকের অবস্থান ও কর্মক্ষেত্র পৃথক। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিগতভাবেই স্বতন্ত্র। তাই সকল ক্ষেত্রে তাদের সমান অধিকার নিয়ে চলা নিজেদের জন্যই কল্যাণকর নয়। প্রকৃতি মাতৃত্বের পবিত্র দায়িত্ব সম্পূর্ণ নারীর ওপর সোপর্দ করেছে। সেই সঙ্গে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত স্থান কোথায়, তাও বাতলে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে পিতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পুরুষের ওপর। সেই সঙ্গে মাতৃত্বের মতো গুরুদায়িত্বের বিনিময়ে তাকে আর যেসব কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাও প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। উপরন্তু এ উভয় প্রকার দায়িত্ব পালনের জন্য নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠন, শক্তি সামর্থ্য ও ঝোঁক প্রবণতায়ও বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রকৃতি যাকে মাতৃত্বের জন্য সৃষ্টি করেছে, তাকে ধৈর্য, মায়া, মমতা, স্নেহ ভালোবাসা প্রভৃতি বিশেষ ধরনের গুণে গুণান্বিত করেছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নারীর ভেতরে এসব গুণের সমন্বয় না হলে তার পক্ষে মানবশিশুর লালন পালন করা সম্ভবপর হতো না। বস্তুত মাতৃত্বের মহান দায়িত্ব যার ওপর অর্পণ করা হয়েছে, তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। যার জন্যে রুক্ষতা ও কঠোরতার প্রয়োজন। এ কাজ শুধু তার দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, যাকে এর উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে পিতৃত্বের মতো কঠোর দায়িত্ব থেকেও তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে নারীকে আজ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং পর্নোগ্রাফীতে। আর এটি উসকে দিচ্ছে পর্দাহীনতাকে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী যেন আজ একটি অপরিহার্য বিষয়।

পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের মন যা চায় আমরা তাই করে বসি। এক্ষেত্রে ইসলাম, কুরআন সুন্নাহর কী নির্দেশনা রয়েছে তা ভুলক্রমেও খুঁজে দেখি না। আর এ কারণেই আমাদের অধঃপতন দিন দিন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার মন আমার উপস্থাপিত আদর্শের বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকার করে নেবে।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকবে না। কেউ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে। *[সূরা আহযাব : ৩৬]*

যারা সমান অধিকারের নামে নারী ও পুরুষের এই প্রকৃতিগত পার্থক্যকে মিটিয়ে দিতে চায়, তাদের প্রতি বিশেষজ্ঞগণ অনুরোধ জানিয়েছেন যে, আপনারা এ পথে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে মনে করে নিন যে, এ যুগে পৃথিবীর আদতেই মাতৃত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, যদি কেউ এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, তাহলে আনবিক বোমার প্রয়োগ ছাড়া অল্প দিনের মধ্যেই মানবতার চূড়ান্ত সমাধি রচিত হবে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারেন এবং নারীকে তার মাতৃসুলভ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মতো রাজনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকার্য, যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারেও অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেন, তাহলে তার প্রতি নিঃসন্দেহে চরম অবিচার করা হবে।

নারীর ওপর প্রকৃতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তা নিঃসন্দেহে মানবতার অর্ধেক সেবা। আর এই সেবাকার্য সে সাফল্যের সাথেই সাধন করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুরুষের নিকট থেকে সে বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা পাচ্ছে না। অথচ অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক দায়িত্বও আবার আপনারা নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। এর ফল এ দাঁড়াবে যে, নারীকে পালন করতে হবে মোট দায়িত্বের তিন চতুর্থাংশ এবং পুরুষের ওপর বর্তাবে মাত্র এক-চতুর্থাংশ। এটি কি সত্যিকারেই কোনো নারীর প্রতি সুবিচার ও বিবেকপ্রসূত?

নারীরা যেন এসবের কাছে অসহায়! তারা এ জুলুম অবিচারকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ জুলুমের বোঝাকে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য লড়াই করছে। এর মূল কারণ হলো, তারা পুরুষদের কাছে যথার্থ সমাদর পাচ্ছে না। ঘর সংসার ও মাতৃত্বের মতো কঠিন দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করা সত্ত্বেও আজ তারা সমাজে উপেক্ষিত, অপাংক্তেয়। সন্তানবতী ও গৃহিণী মেয়েদেরকে আজকের সমাজের কোথাও কোথাও ঘৃণা করা হয় এবং স্বামী ও সন্তান-সন্ততির এতো সেবাযত্ন করা সত্ত্বেও তাদের যথার্থ কদর করা হয় না। অথচ এসব কার্যে তাদের যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা পুরুষদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত দায়িত্বের চাইতে কোনো অংশেই কম নয়।

মূলত নারী-পুরুষের সমান অধিকারের মধ্যে আর যাই হোক নারীর কল্যাণ নেই; বরং তাতে তার ঠকই বেশি। আজকের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা বস্তুত নারীদের সমান অধিকারের স্লোগান দিয়ে তাদের প্রকৃত অধিকার খর্ব করতেই মরিয়া হয়ে ওঠেছে। তাই এ ব্যাপারে নারীদেরকে তাদের অধিকারের স্বার্থেই সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

অপরূপার দীঘল কেশ

নারীর অন্যতম শোভা হলো কালো দীঘল কেশ। তাদের ঢেউ খেলানো চুল নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা অসংখ্য কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু অপরূপা নারীর সেই দীঘল কেশ যেন আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আজ কথিত আধুনিকতার দাবিদাররা মেয়েদের চুলও পুরুষের মতো ছোট করে রাখতে প্ররোচিত করছে।

আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলের যত্ন নিতে বলেছেন। বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি উসকো খুশকো চুল নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলেন। তখন নবীজি তাকে বললেন, তোমার কি চিড়ুনি নেই? *[সুনানু আবি দাউদ]*

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি রাখাকে উৎসাহিত করেছে। খোদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং তা পরিপাটি করে রাখতেন। *[শামায়েল]*

ইসলাম নারীদের চুল লম্বা এবং পুরুষের চুল ছোট রাখতে উৎসাহিত করেছে। অথচ আজকের পরিবেশ তার বিপরীত। ইদানীং নারীরা চুল খাটো করে এবং ছেলেরা ফ্যাশনেবল লম্বা চুল রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে।

ইদানীং চুলের নানা ফ্যাশন লক্ষ্য করা যায়। এমনকি এতে যে ইসলামি ভদ্রতার প্রতীক রয়েছে, তা বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে। চুলের ফ্যাশন হাল আমলে আধুনিকতার দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু কিছু তরুণী আছে, যারা এমনভাবে চুলের ফ্যাশন করে, হঠাৎ দেখলে তাদেরকে ভিন্ন গ্রহের আজব কোনো প্রাণীর মতো মনে হয়।

চুলের এই ফ্যাশনে প্রতিদিনই নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। যোগ হচ্ছে নতুন নতুন নাম। মনে হয় চুলের রাজ্যে ফ্যাশনের তাড়া খেয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছে ফ্যাশনেবল তরুণীর দল। তারা স্থির করে বলতে পারছে না

কেমন চুল, কেমন স্টাইল তাদের কাম্য কিংবা পছন্দ। তারা ভুলে গেছে, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। পাশ্চাত্যের ভাড়া করা কালচার লালনেই তারা তৃপ্তির ঢেঁকুর গিলছে।

অভিশপ্ত ফ্যাশনের নির্মম শিকার এই সমাজে এখন নর-নারীর পার্থক্য পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে। কে ছেলে আর কে মেয়ে নির্ণয় করা হয়ে পড়েছে ভীষণ মুশকিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদের প্রতি এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (অর্থাৎ যারা বেশ ভুষায় একে অপরের রূপ ধারণ করে, তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন)। *[বুখারি, মা'আরিফুল হাদিস : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯৪ পৃ.]*

এ কথা অনস্বীকার্য যে, নারীর সৌন্দর্য চুলে। কিন্তু ইদানীং দেখা যায় নারীরা চুল কেটে এতো ছোট করে ফেলে যে, এটা দেখে বোঝা যায় না যে, সে ছেলে নাকি মেয়ে। অথচ নারীর লম্বা চুল তার জন্য কত উপকারী তা যদি সে জানত তবে কখনো চুল কেটে ছোট করত না।

কানাডার ফিজিওথেরাপিস্ট স্যার জেমস সাগম এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন, মেয়েদের দীঘল কেশ তার ত্বক, দেহ, মস্তিষ্ক, শিরা-উপশিরার খিঁচুনি, মাথা ব্যথা, ঘাড়ের রগের ব্যথা, দৃষ্টিশক্তি, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি থেকে অনেকাংশে রক্ষা করে।

কোনো মেয়ে যদি সবসময় তার চুলগুলো কেটে কান বরাবর রাখে-তবে তার উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হতে পারে। আর দীঘল তথা লম্বা চুল এগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ এর ফলে মাথা বার বার আঁচড়ানো হয়, বেনী কাটা হয়, ফিতা তোলা হয়, আর মাথা আঁচড়ানোর দ্বারা এক প্রকার উষ্ণতা এবং শরীরে এনার্জি সৃষ্টি হয়। যা পশম বা চুলের মাধ্যমে শরীরের শিরাতন্ত্রীকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে। এমনকি নিয়মিত চুল আঁচড়ালে চুল বৃদ্ধি পায় এবং ঘন হয়।

মাথার চুল আঁচড়ানোর আরেকটি হেকমত হলো, যদি চুল আঁচড়ানো না হয় তবে তাতে জীবাণু আটকে থাকে। যা চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এক সময় তা ভয়াবহ রূপ নেয়। চুল না আঁচড়ালে উকুন বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চুলের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা খুবই জরুরি। মাথার ত্বকের অপরিচ্ছন্নতা থেকে রোগব্যাধির জন্ম হতে পারে এবং অন্যত্রও তা ছড়িয়ে যেতে পারে।

বিশেষত চুলের গোড়ায় যে খুশকি হয় তা চুল পড়ে যাওয়া এবং টাক পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাথার খুশকির কারণে আবার চোখেও রোগ হতে পারে। তাই মাথার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

নারীদের সৌন্দর্য লম্বা কেশের সাথে অধিক সম্পর্কিত। তাই ইসলামি জীবনব্যবস্থায় নারীদের চুল কমানো ও পশম কাটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গবেষণায় জানা যায় যে, যখন নারীদের এ চুল কেটে বা ছেঁটে ফেলা হয় বা বিশেষ হেয়ার বিন্যাস করা হয়, তখন নারী দেহে নানা রূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীদের চুল বৃদ্ধি তাদের সুস্থতা ও সবলতার জন্য অতীব জরুরি। কেননা তাদের চুল যত বৃদ্ধি পাবে, ততই তাদের ধৈর্য-সহনশীলতা, কমনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। আর অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে তারা।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহিলাদের জিন ও হরমোন আর পুরুষদের জিন ও হরমোনে আকাশ-জমিন পার্থক্য। এ কারণে পুরুষের চুল কাটা বা মুণ্ডানোর কাজ তাদের জন্য অনেক বেশি উপকারী। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে ঐ নারী জাতি যাদের চুল কুদরতিভাবে লম্বা ও ঘন হয়, তারা যদি সে চুল কাটে, ছাঁটে বা মুণ্ডায়, তাহলে তাদের দেহে এমন ব্যাধি দেখা দেয়, যার বিবরণ ব্যাধির তালিকায় বিদ্যমান। এরূপ নারীরা দৈহিক রোগ-ব্যাধি যথা ডিপপ্রেসার, ফাস্টেশন, এনজাইটি ও আত্মহত্যার শিকার বেশি হয়।

মেহেদিরাঙা হাত

কবি-সাহিত্যিকদের ছন্দের অন্যতম উপাদান নারী। নারীকে নিয়ে কল্পনা করেনি কিংবা নারীর প্রেমে পাগল হয়নি, এমন কবি, সাহিত্যিক কিংবা লেখক পাওয়া ভারী মুশকিল। তাদেরই গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, নারীর দেহের যে কয়টি অঙ্গ পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় তন্মধ্যে হাত অন্যতম। যুবতি কিংবা তরুণীর মেহেদিরাঙা হাতের দিকে নজর দেয়নি এমন যুবক কিংবা তরুণ খুব কমই পাওয়া যাবে। তাই নারীর সৌন্দর্যের অন্যতম প্রতীক হাতকে প্রদর্শন হতে হেফাজত করা তার নিজের জন্যই অপরিহার্য।

ইসলামি পর্দাবিধানের পরিপূর্ণতা ও তাকওয়া হিসেবে ইসলামি চিন্তাবিদগণ মেহেদিরাঙা কোমল হাতকে ঢেকে রাখাকে জরুরি মনে করেছেন। মূলত ইসলামি বিধানের প্রতিটি নিয়মের মাঝে যেমন পরকালীন মুক্তি রয়েছে, তেমনি রয়েছে ইহকালীন কল্যাণও।

নারীর হাত ঢেকে রাখাকে ইসলামি শরিয়ত বাধ্যতামূলক না করলেও হাত মোজাকে ওলামা মাশায়েখগণ তাকওয়ার পোশাক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'নারীর সমগ্র দেহই সৌন্দর্য স্বরূপ।'

হাত নারীর অন্যতম সৌন্দর্য প্রকাশকারী অঙ্গ। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

অর্থাৎ, তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য শুধুমাত্র ততটুকু ব্যতীত যতটুকু স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়ে। *[সূরা আন নূর : ৩১]*

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হাত যদিও স্বভাবগত দিক থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। তথাপি যেসব কারণে নারীর চেহারা ঢেকে রাখাকে ফোকাহায়ে কেরাম আবশ্যক মনে করেছেন, সেই একই কারণে হাত ঢেকে রাখাকেও আবশ্যক মনে করে থাকেন। আর এ কারণেই হাত মোজা পরার নিয়ম চালু হয়েছে।

এতক্ষণ হাত মোজা পরার শরয়ি যৌক্তিকতা পেশ করা হলো। এবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর উপকারিতা প্রদত্ত হলো।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে, যেসব নারী তাদের হাতসহ শরীরের নানা অঙ্গ খোলা রাখে তারা ম্যালানোমা নামের এক বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বে প্রতি ৬২ মিনিটে একজন নারী মারা যায় ম্যালানোমা রোগে আক্রান্ত হয়ে। এতৎপ্রাসঙ্গিক এক গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষ্য হলো–

> "About 65 percent of melanoma cases can be attributed to ultraviolet (UV) radiation from the sun. "

আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, ম্যালানোমা রোগের আশঙ্কা মেয়েদের বেশি হয়ে থাকে। মেয়েদের ত্বক কোমল আর বেশি নার্ভ ফাইবার থাকার দরুন

তাদের ত্বকের প্রতি স্কয়ার সেন্টিমিটারে ৩৪ নার্ভ ফাইবারস আর পুরুষের মাত্র ১৭। আর এ কারণেই নারীর ত্বকের সুরক্ষার জন্য হাত মোজা পরাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ কল্যাণকর মনে করেছেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, যাদের কোমল হাত মোজায় ঢেকে থাকে তাদের হাত নানা চর্মরোগ তথা খুজলি, চুলকানি, অ্যাকজিমা, দাদ থেকে মুক্ত থাকে। কারণ মোজায় হাত ঢেকে থাকার কারণে তাদের হাত ধুলাবালি থেকে সুরক্ষিত থাকে।

আজকের আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক তরুণী তাদের হাতকে কোমল ও মসৃণ রাখতে হাত মোজা ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে। এটি মূলত ইসলামি বিধানেরই সংস্করণ। দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামের হাত মোজা পরার নিয়মকে এক শ্রেণির কথিত ফ্যাশনী নারী অবজ্ঞাচ্ছলে ভ্রু কুঁচকালেও বর্তমানে তারা এসবকে নিজেদের ত্বক সুরক্ষার উপায় বলে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

পায়ে তার নূপুরের ছন্দ

নারীর আপাদমস্তকই মূল্যবান সম্পদ। তরুণীর পায়ের নূপুরের ছন্দ মন কাড়েনি এমন যুবকের সংখ্যা কম নয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, নারীর সমগ্র দেহটিই সৌন্দর্যের সমাহার।

যুক্তির কথা হলো, যে কোনো মূল্যবান জিনিস ঢেকে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় হলো, দামি জিনিসকে একেবারে খোলামেলা না রাখা।

আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর পায়ের তালু পর্যন্ত পুরো শরীরটাকেই পর্দাভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, তা ঢেকে রাখার উপকারিতা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কথিত আধুনিকতার দাবিদাররা এতদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে 'মান্ধাতার আমলের' বলে মুখ ভেংচি কাটতো। কিন্তু দেড় হাজার বছর পর এসে আজ বিজ্ঞানীরা এর সত্যতা প্রমাণ পেয়েছে!

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *[সূরা নূর : ৩১]*

এই আয়াতাংশে নারীকে সজোরে পদচারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে তাদের পায়ের অলংকার, বেড়ি, ঝুমুর, নূপুর ইত্যাদি সম্বন্ধে বেগানা পুরুষ অবহিত হতে না পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, পুরুষের প্যান্ট বা কাপড় পায়ের টাখনুর উপর পরতে হবে। অন্যথায় তারা জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে মেয়েরা তাদের কাপড় বা পায়জামা টাখনুর নিচে পরবে এবং পরিপূর্ণ পর্দা করে চলবে। অন্যথায় তারা জাহান্নামে যাবে। *[বুখারি : ৫৩৭১]*

চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে, পুরুষের পায়ের পাতার অংশে প্রচুর পরিমাণে হরমোন থাকে এবং তার আলো বাতাসের প্রয়োজন হয়। তাই কেউ যদি তা খোলা না রেখে ঢেকে রাখে, তাহলে তার যৌনশক্তি কমে যাবে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে।

তদ্রুপ মেয়েলোকের হরমোন কম থাকে এবং তা ঢেকে রাখার প্রয়োজন হয়। যদি কোনো নারী তা ঢেকে না রাখে এবং খোলা রাখে তবে তার যৌনশক্তি কমে যাবে এবং যৌনবাহিত ও নারীবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, যেসব নারী পা খুলে খোলামেলা চলাফেরা করে, তাদের সিফিলিস, গনোরিয়া, বহুমূত্র এবং কৃমির রোগ দেখা দেয়। তাদের চুলপড়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে, যেসব নারী তাদের পাসহ শরীরের নানা অঙ্গ খোলা রাখে তারা ম্যালানোমা নামের এক বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, ম্যালানোমা রোগের আশঙ্কা মেয়েদের বেশি হয়ে থাকে। মেয়েদের ত্বক কোমল আর বেশি নার্ভ ফাইবার থাকার দরুন তাদের ত্বকের প্রতি স্কয়ার সেন্টিমিটারে ৩৪ নার্ভ ফাইবারস আর পুরুষের মাত্র ১৭। আর এ কারণেই নারীর ত্বকের সুরক্ষার জন্য হাত মোজা ও পা মোজা পরাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ কল্যাণকর মনে করেছেন।

যাদের পা মোজায় ঢেকে থাকে তাদের পা নানা চর্মরোগ তথা খুজলি, চুলকানি, অ্যাকজিমা, দাদ থেকে মুক্ত থাকে। কারণ মোজায় পা ঢেকে থাকার কারণে তাদের হাত ধুলাবালি থেকে সুরক্ষিত থাকে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারী পায়ের টাখনুর নিচের অংশ খোলা রেখে চলে, তাদের পায়ের নখের নানা রোগ দেখা দেয়। নখ হালকা হয়ে যাওয়া, নখ ভেঙে যাওয়া, কালচে হওয়া, নখচিপা রোগ, নখের ভেতরে পুঁজ জমা, নখের ব্যথা করাসহ নানা রোগ তাদেরই বেশি হয় যারা পা খোলা রেখে চলে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এক সময় মানুষ ক্রমেই ইসলামি অনুশাসনকে নিজেদের কল্যাণ মনে করতে থাকবে।

সত্যিই আজ নিজের অজান্তেই অনেকে ইসলামি বিধানকেই সর্বাধুনিক এবং ফ্যাশন বলে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে।

এক সময় দাড়ি রাখাকে কথিত সভ্যতা ও আধুনিকতার পরিপন্থী বলে মনে করা হতো। আজ অনেকেই দাড়ি রাখাকে স্টাইল হিসেবে নিয়ে থাকেন। বিখ্যাত ফুটবলার, ক্রিকেটার, কুস্তিবিদ ও নায়কের সাম্প্রতিককালের রাখা দাড়ির স্টাইল ভক্তবৃন্দের মাঝে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। আধুনিক দাবিদার যুবকরা নিজেদেরকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের এক মাধ্যম মনে করেন দাড়িকে।

আবার এক সময় পুরুষের টাখনুর নিচে কাপড় পরাটা তথাকথিত ফ্যাশন বলে মনে করা হতো। কে কতো লম্বা ও পায়ের পাতা মুড়িয়ে এমনকি পায়ের পাতা পর্যন্ত প্যান্ট জুতার ভেতরে ঢুকিয়ে পরাকে আধুনিকতা মনে করা হতো। কিন্তু আজকের আধুনিকতার দাবি হলো খাটো প্যান্ট পরা। তাইতো হাফ কোয়ার্টার তথা টাখনুর উপর হাঁটুর নিচ পর্যন্ত প্যান্ট পরাটাকে এখন আধুনিকতার প্রতীক মনে করা হয়। দেখুন আজ হতে দেড় হাজার বছর আগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, পুরুষের টাখনুর যে অংশ অহংকারবশত কাপড়ে ঢেকে থাকে, তা জাহান্নামে যাবে। *[বুখারি ও মুসলিম]*

সুদীর্ঘকাল এ সত্যতা অনেকের বুঝে না আসলেও এখন সেই বিধানকেই কল্যাণকর মনে করা হয়ে থাকে। তাইতো এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন পায়ের পাতা ঢেকে রাখাটাকেই মেয়েরা প্রকৃত আধুনিকতা মনে করতে বাধ্য হবে।

ইদানীংকালে আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক তরুণী তাদের নূপুরপরা পা-কে কোমল ও মসৃণ রাখতে পা মোজা ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে। কলেজ ভার্সিটিতে মেয়েরা পা মোজা পরাটাকে অন্যতম ফ্যাশন মনে করতে শুরু করেছে। কারণ পা মোজায় ঢেকে থাকার কারণে একদিকে যেমন তাদের ত্বক সুরক্ষা হয়, তেমনি পায়ের দোষগুলো অন্যের সামনে ফুটে ওঠে না। এটি মূলত ইসলামি বিধানেরই সংস্করণ।

দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামের পা মোজা পরার নিয়মকে এক শ্রেণির কথিত ফ্যাশনি নারী অবজ্ঞাচ্ছলে ভ্রু কুঁচকাত। তারা মনে করত যে, পা মোজা পরা তো মোল্লাদের পরিবারের মেয়েদের কাজ। তবে আশার কথা হলো, আজকের আধুনিক নারীরা তাদের সৌন্দর্যকে ধরে রাখার অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই পা মোজা ব্যবহার করা শুরু করেছে।

তাই চিরন্তন ফ্যাশনের ধর্ম ইসলাম যুবতি, তরুণী নির্বিশেষে সব নারীকে আহ্বান জানাচ্ছে তাদের কোমল পা-কে মোজায় ঢেকে রাখতে।

কোন কাননের ফুল গো তুমি!

ফুলকে ভালোবাসে না এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। নারী ফুলতুল্য। ফুলকে যেমন সবাই ভালোবাসে, নারীকে কেউ ভালো না বেসে পারে না। নারী হলো মন বাগিচার ফুল। তার সৌরভ ও সুগন্ধিতে পুরুষ হয় মাতোয়ারা।

নারী মানবসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ও মূলস্তম্ভ। তারা মানব বাগিচার শোভা। তাই ইসলাম অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে নারীর প্রাপ্য যাবতীয় অধিকার প্রদান করেছে। নারীকে ইসলাম গৃহকর্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায় ও মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতে ইসলাম নারীর ব্যক্তিগত মালিকানা অনুমোদন করেছে। স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে স্বামীর সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দ্বিতীয় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বৈধতা ইসলাম শুধু স্বীকার করেনি; বরং উৎসাহিতও করেছে।

মন বাগিচার ফুল খ্যাত নারীকে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছে ইসলাম। আর সেই সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সব রকম ব্যবহারের অধিকার দিয়েছে। তাকে সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। ইসলাম নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার নিশ্চিত করেছে।

হযরত ওমর ফারুক রা. বলেন, ধর্মহীন অজ্ঞানতার যুগে নারীকে 'বিবেচনা করার উপযুক্ত' এমন কিছু মনে করতাম না। (অর্থাৎ সমাজজীবনে

তাদেরকে বিশেষত্ব অথবা গুরুত্ব দিতাম না) কিন্তু ইসলামের সাথে আমাদের পরিচিতির পর আল্লাহ তায়ালা নারীদের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব তুলে ধরতে স্বতন্ত্র আয়াত অবতীর্ণ করলে তাদের দায়িত্বে আমাদের প্রাপ্য থাকার ন্যায় আমাদের দায়িত্বেও তাদের প্রাপ্য থাকাকে আমরা উপলব্ধি করলাম। *[বুখারি শরীফ]*

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কুরআন বর্ণিত উত্তরাধিকারী আইন ও নারীর অধিকারসমূহ ইউরোপীয় উত্তরাধিকার ও নারী অধিকার সংক্রান্ত আইনের তুলনায় অনেক বেশি কল্যাণকর এবং তার ব্যাপ্তিও বেশি। নারীর প্রতিকৃতির সাথে এ আইনগুলোও সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারীর অধিকার বিষয়ে কুরআন এবং হাদিস অত্যন্ত গুরুত্ব তুলে ধরেছে। ইসলামই যে নারীকে অন্য সকল ধর্মের তুলনায় বেশি মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, তা অমুসলিমরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কতিপয় অমুসলিম ঐতিহাসিক ও প্রাজ্ঞ মনীষীর অভিমতই বলে দিবে যে, ইসলামই মূলত নারীর অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা, জিম্মাদার ও নারী স্বাধীনতার রক্ষক।

নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার আন্দোলনের তথাকথিত ধ্বজাধারী গোষ্ঠী এবং ইসলামি শিক্ষার অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের আত্মজাগরণ হওয়া দরকার। কেননা অসংখ্য অমুসলিম দার্শনিক, ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক এমনকি গির্জার পাদ্রী পর্যন্ত ইসলামকে 'নারী স্বাধীনতা ও নারীমুক্তি'র বার্তা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

ইসলাম নারীদের কৃষ্টির ওপর অত্যন্ত সার্থক ও সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। ইসলাম লাঞ্ছনা-বঞ্চনা থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়েছে। কম-বেশি সর্বক্ষেত্রে তাদের অবস্থাকে উন্নততর করেছে।

কুরআন বর্ণিত 'উত্তরাধিকার আইন ও নারীর অধিকারসমূহ' ইউরোপীয় উত্তরাধিকার ও নারী অধিকার সংক্রান্ত আইনের তুলনায় অনেক বেশি কল্যাণকর। জীবনের একেকটি ক্ষেত্রকে আইনের সীমায় আনয়নের দিকে থেকে এর ব্যাপকতা বেশি এবং নারীর প্রকৃতির সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ফ্রান্সের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ড. মজিদ লিখেছেন– নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ওপর ইসলামের অবদান কী তা আলোচনা করার উত্তম পদ্ধতি হলো ইসলামি দর্শন ও নারী সংক্রান্ত আইন কানুনের প্রভাবে পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে নারীরা কী অবস্থায় ছিল, তা অবহিত হওয়া।

কুরআনুল কারীমের কতক বিধিনিষেধ থেকে ইসলামের পূর্বে নারীদের সাথে কৃত আচরণ অনুধাবন করা যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "বিবাহ কর না ঐ মেয়েদেরকে যাদেরকে ইতিপূর্বে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছেন। এটি অশ্লীল ও সর্বনাশা কাজ ও নিকৃষ্ট প্রথা। তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনী কন্যা, তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা- যারা তোমাদের লালনপালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তাহলে এ বিবাহে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দু'বোনকে একত্রিত করা, তবে যা অতীত হয়ে গিয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।" *[সূরা নিসা ২২-২৩]*

এ আয়াতের বিধি-বিধান থেকেই বোঝা যায়, যারা এ সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলে তাদের কর্মপন্থা কতইনা মহৎ, কতইনা পবিত্র।

বিশেষজ্ঞ ড. মজিদ আরো লিখেন– ইসলাম নারী সম্পর্কিত যে বিধান প্রস্তাব করেছে, তা' নারীদেরকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে এবং সে প্রভাব কতটুকু ইতিবাচক বা নেতিবাচক তা অনুধাবন করতে হলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে- এমন সমাজে, এমন যুগে নারীদের অবস্থা পর্যলোচনা করতে হবে।

ঐতিহাসিকভাবে ইসলামি সংস্কৃতিতে নারীকে দেড় হাজার বছর আগেই সেই মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা পাওয়ার জন্য ইউরোপের নারীরা আজ আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে।

কার উসিলায় শিন্নি খাও

জীবন বাগানের শোভা নারী। তারা আমাদের পুষ্পকানন। নারীবিহীন জীবন খা খা মরূদ্যান। ইসলাম এ ফুলকে দিয়েছে অভূতপূর্ব মর্যাদা। ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছে। কারণ ইসলামপূর্ব যুগে আরবে অনেক ধর্ম প্রচলিত ছিল বটে; তখনকার সময়ে নারীদের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, যে ইসলাম নারীকে এত মর্যাদায় সমাসীন করল, সেই ইসলামের বিরুদ্ধেই তথাকথিত নারীবাদীরা নাক ছিটকায়। যেই ইসলাম তাদেরকে বেঁচে থাকার অধিকার দিল, যে ইসলাম দিল তাদের সার্বিক নিরাপত্তা, সেই ইসলামের

কথায় তারা কপাল কুঁচকায়। তাই বলতে বাধ্য হই– 'কার উসিলায় শিন্নি খাও গো নারী!'

একমাত্র ইসলামই যে নারীকে প্রকৃত মর্যাদার আসন দিয়েছে তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বিশ্বের অনেক বিখ্যাত মনীষী। একই সাথে তারা এও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, অন্য কোনো ধর্মই নারীকে মর্যাদা দেয়নি; উল্টো তাদের অধিকার খর্ব করেছে।

গ্রিসের বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ গোসতাওলী চান। তিনি লিখেছেন, "গ্রিসে সাধারণত নারীদেরকে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি মনে করা হতো। গার্হস্থ্য কাজকর্ম ও বংশ বৃদ্ধিই ছিল তার কাজ। কোনো নারীর গর্ভে অস্বাভাবিক সন্তান জন্ম নিলে ঐ নারীকে হত্যা করে ফেলা হতো।" তিনি আরো লিখেছেন যে, আগের যুগে নারীদের সাথে কী পরিমাণ কঠোরতা করা হতো, তা তাদের তৈরি আইনের ভাষায় পাঠ করুন– "তুফান, মৃত্যু, জাহান্নাম, বিষ ও বিষধর সাপ কোনো কিছুই এ পরিমাণ ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষকিকর নারী। কিন্তু ইসলামই নারীকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে।"

বাইবেলেও ঠিক অনুরূপ লেখা আছে "নারী মৃত্যুর চেয়েও বেশি তিক্ত।"

বাইবেলের 'তৌরাতের নসীহতনামা' অধ্যায়ে লিখা আছে– খোদার প্রিয় ব্যক্তিরা নিজেকে নারী থেকে দূরে রাখবে। আমি হাজারো মানুষের মাঝে শুধু একজনকে (পুরুষ) প্রিয়তম পেয়েছি। কিন্তু জগতের সমগ্র নারীদের মধ্যে একজনকেও এমন পাইনি, যে খোদার প্রিয়। [তমদ্দুনে আরব : পৃ. ৩৭৬]

বিশিষ্ট ইউরোপিয়ান লেখক প্রফেসর ডিএস মারগুলিউল ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্তক নবীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ, অপবাদ আরোপ, অভিযোগ উথাপন ও নিন্দাবাদের কোনো সুযোগকে কাজে লাগাতে ভুল করেননি। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীগ্রন্থ 'লাইফ অব মুহাম্মদ' রচনা করেন।

এতে মনগড়া অভিযোগের প্রাচূর্যতা থাকা সত্ত্বেও এক জায়গায় লিখেন– "অজ্ঞানতার যুগে আরবগণ ছাড়াও ইহুদি, খ্রিস্টান কেউই কোনোদিন এটা কল্পনা করেনি যে, নারীরাও ইজ্জত, সম্মান ও ধন-সম্পদের অধিকারিণী হতে পারে।"

এই ধর্মগুলো নারীদেরকে তো অনুমতি দেয়নি যে, নারীরা কোনো জীবিকা অবলম্বন করে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাবে। ঐ সমস্ত ধর্ম, কৃষ্টি ও সমাজে একেকজন নারী ছিল একেকজন ক্রীতদাসী। অবশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে নারীকে স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতা দান করেছেন।

বিশিষ্ট বিদ্বান মানসিউরিফলের ভাষ্য হলো– "ইসলামের নবীর যুগের দিকে মনোনিবেশ করলে মনে হয়, তিনিই নারীর জন্য কল্যাণকর বিধি-বিধান প্রণয়ন করেন, অন্য কেউ করেননি। নারীর ওপর তাঁর অনুগ্রহ অনেক। কুরআনে নারীর অধিকার সম্পর্কিত অনেক উচ্চাঙ্গের আয়াত আছে।

নারীর অধিকারের আদর্শ মানদণ্ডের ধারক আইউর মান্ঘম 'দি লাইফ অব মুহাম্মদ' গ্রন্থে লিখেন– এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা আরবদের জীবন এবং এর প্রথম বিষয় হলো– ইতোপূর্বে নারীদের যে সম্মান ছিল না, তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় তারা পেয়েছে। দেহ ব্যবসা, সাময়িক বিবাহ, অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইতিপূর্বে বাঁদীরা মনিবের শুধু ভোগ্যপণ্য হিসেবে পরিগণিত হতো। ইসলাম তাদেরকে অধিকার প্রদান করেছে, মনিবকে তাদের প্রতি সদয় হতে বলেছে।

ডব্লিউ কিশ তার The expansion of Islam গ্রন্থে লিখেন– "ইসলামই সর্বপ্রথম নারী সমাজকে মানবাধিকার প্রদান করেছে এবং তাদেরকে তালাকের অধিকার দিয়েছে।"

ডব্লিউ লাইটার তার Mohammadanism is religious systems of The world গ্রন্থে লিখেন– "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে যে সম্মানের আসনে আসীন করেছেন তা পাশ্চাত্য সমাজ ও অন্যান্য ধর্মে ছিল না।"

প্রফেসর রাম কৃষ্ণ রাও কয়েক বছর পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর ওপর "ইসলামের পয়গম্বর মোহাম্মদ" নামে একটি বই রচনা করেন। এতে ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতা পর্যালোচনা করার পর তিনি লিখেন, "ইসলাম নারীকে পুরুষের দাসত্ব করা থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, মানুষ যেন পূর্বপুরুষের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকে। পুরুষ-নারী একই মৌল উপাদান থেকে সৃষ্ট। উভয়ের একই রকম আত্মা এবং মানসিক ও চারিত্রিক যোগ্যতা সমান হয়ে থাকে।"

তিনি আরো লিখেন, "আরবের এ শিকড় গাঁড়া রীতি ছিল যে, বর্শা ও তলোয়ার ব্যবহার করতে সক্ষমরা একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে পারবে। কিন্তু ইসলাম দুর্বল-অসহায় লোকদের পক্ষাবলম্বন করেছে। নারীকে পিতা-মাতার

উত্তরাধিকারিণী সাব্যস্ত করেছে। কয়েক শত বছর পূর্বে ইসলাম নারীকে সম্পদের মালিকানার অধিকার দিয়েছে। তার ১৩ শত বছর অতীত হওয়ার পর ১৮৮১ ইংরেজিতে গণতন্ত্রের জনক ইংল্যান্ড ইসলামের সে নীতি আঁকড়ে ধরেছে এবং সে নীতিকে 'বিবাহিত নারীর আইন' নামকরণ করে নিজেদের আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। পয়গাম্বরে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দিন পূর্বেই ঘোষণা করেছেন যে, "নারী পুরুষের অর্ধাংশ পাবে, নারীর অধিকার পবিত্র, তা থেকে নারী যেন বঞ্চিত না হয়', সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।"

বিশিষ্ট খ্রিস্টান লেখিকা মিসেস এ্যানী বেসেন্ট তার রচিত The life and teaching of Mohammad গ্রন্থে 'ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেন, "স্মরণ রেখ, ইসলামি বিধান- যার কিয়দাংশ ইংল্যান্ডেও চালু হয়েছে। যা নিশ্চয় সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ ও যুক্তিযুক্ত। সম্পত্তি ও তালাক সম্পর্কিত ইসলামি বিধি পশ্চিমা থেকে অনেক অগ্রগণ্য। আমরা আজকে যেগুলোকে নারী অধিকারের নীতি মনে করি তার তুলনায় ইসলামি নীতি নারীদের অধিকার অনেক ব্যাপকতর করেছে।"

'দি রিলিজিয়ন হিস্ট্রি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড'-এর লেখক জেএম রবার্টস ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে লিখেছেন– "ইসলামের আগমন অনেক দিক বিবেচনায় বিপ্লবাত্মক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম মালিকানা অর্জনকে আইনগতভাবে নারীর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ এ অধিকার খ্রিস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয়ান অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামে গোলামেরও অধিকার ছিল। ঈমানদার লোকদের মাঝে কোনো শ্রেণিভেদ ছিল না। আর না ছিল কোনো জন্মগত বিভেদ। এই বিপ্লবের মূলে ছিল এমন কিছু ধর্মীয় নীতিমালা, যার ভিতরে সবকিছুই নিহিত রয়েছে।'

মোটকথা, ইসলামই নারীকে বেঁচে থাকার প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম পুরুষকে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে জোর তাগিদ দিয়েছে। তারপরও আজকের কথিত নারীবাদীরা ইসলামের নাম শুনলে মুখ ভেংচি কাটে। তাই তাদের উদ্দেশ্যে বলতে বাধ্য হই হে নারী! কার উসিলায় শিন্নি খাও চিনলা না!

অবক্ষয়ের টর্নেডো

সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ে চারপাশ বিষিয়ে ওঠছে। ক্রমেই এ অবক্ষয় মহামারি আকার ধারণ করছে। এ অবক্ষয়ের টর্নেডোতে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ছে। তাই এ অবক্ষয়রোধে সকলের আন্তরিকতাপূর্ণ অংশগ্রহণ জরুরি। প্রথমে এই রোগ শনাক্ত করতে এমন চিকিৎসকের কাছে গমন করা প্রয়োজন যার এ বিষয়ে দক্ষতা, পারঙ্গমতা ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, অনেক ক্ষেত্রে রোগ শনাক্ত হলেও সত্যিকারের চিকিৎসক কিংবা প্রকৃত চিকিৎসা লাভ করা সম্ভব হয় না। ফলে আমাদেরকে রোগ নিয়েই চলাফেরা করতে হয়।

সত্যিকারের রোগ প্রতিরোধের জন্য সত্যিকারের দুনিয়াবিমুখ আলেমে দীনের কাছে গমন করা জরুরি। তাদের পরামর্শ শুনুন। আর সেই মতে চলুন। আচ্ছা! বলুন তো, এই যে গণহারে পরীক্ষাগুলো হয়, এতে দীনের লেশমাত্র আছে কি?

আমার যুক্তি হলো, যে প্রশিক্ষক মসজিদে থাকেন, মানুষের হৃদয় দখল করে আছেন এবং কথা ও কাজে তাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন, তাদের কাছে কোনো পরীক্ষা নির্দেশক নেই, সফলতা-ব্যর্থতা নেই। তারপরও তিনি এসব করতে পেরেছেন, অজেয়কে জয় করে নিয়েছেন।

আমার কথা থেকে একথা ভাবার মোটেই অবকাশ নেই যে, আমি দীনি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিরোধী। কখনও নয়; বরং আমি তার জোরালো পক্ষপাতী। উপরন্তু আমি এখানেই বেশি সময় ব্যয়ের কথা বলি। আমরা যদি অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি, বিয়ে প্রথার সহজায়ন করি; অথচ আত্মিক উন্নতি সাধন এবং দীনি দায়িত্ববোধ অর্জন করতে না পারি, তাহলে এসব আমাদের কোনো কাজে আসবে না।

তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ভয়ই হলো সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক কার্যকর শক্তি। যদি এই শক্তি অর্জিত না হয়, তাহলে নীতি-নৈতিকতা, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং সাংবিধানিক আইন– কোনো কিছু দিয়েই এর ক্ষতি পূরণ করা যাবে না।

কারণ, নীতি অটুট থাকে পুলিশের উপস্থিতি পর্যন্ত। একই সাথে চরিত্র বহাল থাকে মানুষের দৃষ্টির সম্মুখ পর্যন্ত। এখন কেউ যদি মানুষ ও পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে পারে, তাহলে সাথে সাথে নীতি ও চরিত্র দুটোই অবনতি

ঘটবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। এটিই বাস্তবতা। কিন্তু তার মধ্যে যদি আল্লাহ তায়ালার ভয় থাকে তাহলে তার দ্বারা গোচরে কিংবা অগোচরে কোনোভাবেই অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই জীবনপথের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো আল্লাহ্‌র ভয়।

মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য হলো, তারা লাভ সামনে রেখে কাজ করে। জগতে এমন কেউ আছে কি, যে প্রচণ্ড ক্ষুধা পেটে চেপে জীবনের একমাত্র সম্বল দুটি পয়সা মানুষের অগোচরে লুকিয়ে রাখবে এবং না খেয়ে সময় পার করতে থাকবে?

আপনারাই বলুন তো, কে এমন ব্যক্তি?

হ্যাঁ, তিনি হলেন মুমিন ব্যক্তি। তিনিই সত্যিকারের মুমিন ব্যক্তি। তিনিই এমন করতে পারেন; বরং এর চেয়ে বেশিও করতে পারেন।

কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, পরকালে মহান আল্লাহ্‌ এক পয়সার বিনিময়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং জগতের সাধারণ ক্ষুধার তিক্ততাকে পরলোকের অসাধারণ মিষ্টতায় পরিণত করে দিবেন।

সত্যিকারের মুমিন ব্যক্তির মাঝে সবসময় আল্লাহ্‌ তায়ালার ভয় বিরাজমান থাকে। ফলে তার দ্বারা কোনো লজ্জাহীন কাজ করা সম্ভব হয় না। লজ্জাশীলতাকে মানুষের ধর্মগত নৈতিক স্বভাব ও আখলাক স্বীকৃতি দিয়ে এ মর্মে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন–

إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

প্রত্যেক দীনেরই একটি নৈতিক স্বভাব ও আখলাক রয়েছে। আর ইসলামের সেই আখলাক বা নৈতিক চরিত্রটি হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন–

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ.

লজ্জাশীলতা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ আর ঈমানের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

اَلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قُرَنَا جَمِيْعًا.

লজ্জাবোধ ও ঈমান হচ্ছে এক সাথে মিলিত ভ্রুস্বরূপ। একটির অবর্তমানে অপরটির বিয়োগ অনিবার্য।

তাই যে মুমিন একমাত্র আল্লাহকে ভয় করেন তিনি সবসময় অশ্লীলতাকে লজ্জা করে কল্যাণের কাজে নিয়োজিত এবং অকল্যাণ থেকে বিরত থাকেন। চাই একাধিক হোক বা মানুষের সাথে হোক। কারণ, তিনি বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ তার সাথে আছেন, তিনি সর্বদা তাকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভালো-মন্দ যা কিছুই করা হোক না কেন, এগুলোর কোনোটিই বৃথা যাবে না; বরং আল্লাহর কাছে অচিরেই এসবের প্রতিদান মজুদ পাবেন। আর তার সব সাধনা যেই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে, তাহলো মাওলার দীদার। প্রেমিক যেমন তার প্রেয়সী কিংবা প্রেমাস্পদের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করেন, প্রকৃত আল্লাহপ্রেমিক আশিকও মাওলার সাক্ষাৎলাভের আশায় সব করে থাকেন।

তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সামাজিক অবক্ষয় কিংবা নৈতিক অবক্ষয়ের টর্নেডো রোধের একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহভীতি।

লিভ টুগেদার

অন্যায়ের দাবানলে পুড়ছে চারদিক। এ আগ্নেয়গিরির লাভা নীতিনৈতিকতা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে। এর স্বীকার হচ্ছে গোটা দেশ ও জাতি। পাশাপাশি এর হাত ধরে ভাঙন ধরছে পরিবারে। ছড়িয়ে পড়ছে গৃহবিবাদ।

ইদানীং লিভ টুগেদারের প্রবণতা আমাদের সমাজে প্রকট আকার ধারণ করছে। বিবাহের পূর্বেই প্রস্তাবিত বর-কনের যৌন চাহিদা পূরণকে এককথায় লিভ টুগেদার বলা হয়ে থাকে। মূলত এসবই আমাদের সমাজের জন্য এক ভয়াবহ বার্তা বয়ে বেড়াচ্ছে। পর্দাহীনতার ক্রমান্বয়ে এ অপরিণামদর্শিতা আমাদের আধুনিক মহলে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। লিভ টুগেদার ধর্ষণের প্রকোপ মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি ঘটায়। ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা জানা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী এ বিষয়ে রিপোর্ট করে না। ফলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, বাস্তবে তা অনেক বেশি ঘটে। এ পর্যায়ে লিভ টুগেদারের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছি।

ব্রিটিশ পুলিশের মতে, ১৯৮৪ সালে এক বছরে ব্রিটেনে ২০ হাজারের অধিক নিগ্রহ এবং দেড় হাজার লিভ টুগেদার ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। The London Rape Crisis Center-এর মতে, ব্রিটেনে প্রতিবছর অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড হয়ে থাকে। আর প্রকৃত সংখ্যা তার চাইতেও বেশি। উক্ত সংস্থার মতে, "If we accept the

highest figures, we may say that, on average, one rape occurs every hour in England." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়াবহ। এখানে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। সে সংখ্যা জার্মানির সংখ্যার চাইতে চারগুণ, ব্রিটেনের চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে প্রায় বিশগুণ বেশি।

সবচাইতে উদ্বেগজনক এবং বাস্তবতা এই যে, ৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা। আর ১৬% নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা। যাকে লিভ টুগেদারের সংজ্ঞায় ফেলে থাকেন বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী।

National Council for Civil Liberties নামক সংস্থার মতে, ৩৮% ক্ষেত্রে পুরুষ তার অফিসিয়াল ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ করে থাকে। আর ৮৮% মহিলা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। এই হলো তথাকথিত উন্নত ও নারী-স্বাধীনতার দাবিদার দেশগুলোর অবস্থা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিবাহপূর্ব সহবাস এবং 'Live Together' -এর প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০ সালে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটেনের নারীদের প্রায় অর্ধেক প্রাক-বিবাহ সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল যে, এর ফলে নর-নারী একে অপরকে ভালোভাবে জানতে পারে এবং এর পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তা স্থায়িত্ব লাভ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই সর্বাধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে। ১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। ১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৮ হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৭৫ হাজারে। পক্ষান্তরে বিবাহের হারে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি।

আজকের বিশ্বের কুমারী মাতৃত্বের অন্যতম কারণ হলো পর্দাহীনতা। পশ্চিমা-বিশ্বের তথাকথিত 'নারী স্বাধীনতা'র আরেক অভিশাপ হলো কুমারী মাতৃত্ব।

ব্রিটেনে এক জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে কুমারী-মাতার সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১৫ হাজারে।

১৯৯২ সালে জন্ম নেয়া শিশুদের ৩১% ছিল অবিবাহিতা মাতার সন্তান। এই অবিবাহিতা বা কুমারী-মাতাদের মধ্যে আড়াই হাজারের বয়স ১৫ বছরের নিচে। বৈধ বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুর তুলনায় অবৈধ শিশুর জন্মের হারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরদিকে অবৈধভাবে জন্ম নেয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী-মাতা বা একক-মাতৃত্বের (single mother) ওপর। নারীর ওপর কুমারী-মাতৃত্বের এই দায়ভার পশ্চিমা-বিশ্বে নারী-নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ।

এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে প্রচলিত লিভ টুগেদারের পশ্চিমা জগতের ঘুণেধরা সমাজের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরা হলো। বাস্তবচিত্র তার চাইতেও আরো অনেক বেশি ভয়াবহ। অর্থনৈতিক চাকচিক্য আর প্রযুক্তিগত উন্নতির আড়ালে তথাকথিত 'আধুনিক' বিশ্বের সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় আজ ধস নেমেছে। নারী-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নারী আজ পদে পদে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে ভোগের সামগ্রী হিসেবে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ অনুসরণ এবং পর্দা বিধানকে গ্রহণ করা।

উল্লিখিত সবগুলো পরিণামই ইহলৌকিক পরিণাম। জরিপগুলোকে সুস্থ বিবেক ও মানসিকতা নিয়ে বিবেচনা করলে একটিমাত্র কারণই খুঁজে পাওয়া যায়। আর সেটি হলো, পর্দাহীনতার বিস্তৃতি। যদি আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে তাদের সম্ভ্রম হেফাজতের শিক্ষা দিতাম কিংবা তা রক্ষার ব্যবস্থা করতাম তাহলে আমাদের দেশকে ক্রমেই নরকের কাছে পৌছার চিত্র দেখতে হতো না। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

قُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। *[সূরা নূর : ৩১]*

পরীক্ষামূলকভাবে এবং নিজস্বভাবে সেসব এলাকা বা ব্যক্তিত্ব ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে পর্দার বিধানকে গ্রহণ করেছেন, তারাই রক্ষা পেয়েছেন এই ভয়াবহতা থেকে।

এছাড়া পর্দার বিধান লঙ্ঘন করার কারণে রয়েছে পারলৌকিক পরিণাম। আর এই ইহলৌকিক পরিণামের একটি শেষ বা সীমান্ত রয়েছে। কিন্তু

পারলৌকিক পরিণাম বা শাস্তির কোনো শেষ বা সীমান্ত নেই। সুতরাং একটি সুস্থ বিবেক এবং একটি সুস্থ কিয়াস বা চিন্তাশক্তির বিবেচনায় পর্দা অপরিহার্য একটি বিধান প্রমাণিত।

যৌনরোগের ঔষধ কী

যৌন রোগের ভয়াবহতার কথা বহুবার বলেছি। এর থেকে বেঁচে থাকার জন্য বহু টিপসও বলেছি। কিন্তু সত্যিকারার্থে যৌন রোগের ঔষধ কী? হ্যাঁ সেটিই বলছি। ঔষধ হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ফিরে আসা। আল্লাহ কোনো কিছু হারাম করলে এর স্থলে অন্য একটা কিছু হালাল করে দেন। যেমন– আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন; এর স্থলে ব্যবসায়কে করেছেন হালাল। যেনা হারাম করেছেন; বিপরীতে বিবাহকে করেছেন হালাল। সুতরাং এ রোগের প্রকৃত ঔষধ হলো বিয়ে করা।

বিয়েই একমাত্র সংশোধনের পথ। আমি ইসলামি সংস্থাগুলোর কাছে সুপারিশ করছি, তারা যেন এমন একটি আলাদা বিভাগ চালু করে যেখান থেকে যুবকদের বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা হবে। যেখান থেকে বিয়ে তাদের জন্য সহজ করে দেয়া হবে। উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর সন্ধান দিবে। গরিব হলে ঋণ দিবে। এ প্রস্তাবনা অনেক বিস্তারিত। কেউ এটি বাস্তবায়ন করতে চাইলে আমি আরও ব্যাখ্যা করে দিব।

যৌনতার বিবরণ বাস্তবতার চেয়ে বেশি মনে প্রভাব ফেলে। যদি গান, গল্প, চিত্রশিল্প না থাকত, না থাকত নারীদের রমণীয় করে উপস্থাপন ও ভালোবাসার রঙ-বেরঙের বর্ণনা! তাহলে যারা যুবক আছে তারা শারীরিক সম্পর্কের তীব্রতা এখন যা অনুভব করছ এর দশ ভাগের এক ভাগও অনুভব করতে না। শারীরিক সম্পর্কটা আসলে চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ের মতোই। কিন্তু কাজটা অনেকটা নোংরা ধরনের। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কের মধ্যে নেশা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; যা মানুষকে অস্থির, অন্ধ ও বধির করে তোলে। ফলে মানুষ এতে নোংরা কিছু খুঁজে পায় না। এ নেশাটাই হলো কামনা, প্রবৃত্তি ও যৌন চাহিদা।

কেউ যদি মাথার ঘিলু খাটিয়ে ভাবে কিন্তু হাড়ের ঘিলু দিয়ে না ভাবে, তাহলে বিষয়টি তার কাছে আমি যা বলেছি তা-ই মনে হবে। এই সুড়সুড়ি প্রদায়ক বস্তুগুলো তখনই কাজ করে এবং তিক্ত ফল দেয় যখন খারাপ সঙ্গী মিলে। যে অশ্লীল পথ দেখায়। পৌঁছে দেয় অশ্লীলতার দুয়ারে। অশ্লীলতা

যেন পূর্ণ প্রস্তুত একটি গাড়ি। এক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবরা স্টার্টের কাজ করে। গাড়ি যত শক্তিশালী আর প্রস্তুত হোক না কেন স্টার্ট ছাড়া কোনো কাজ করে না।

যদি বিয়ে করা সম্ভব না হয়, যদি অশ্লীলতা অপছন্দ হয় তাহলে আত্মউন্নয়ন ছাড়া উপায় নেই। আমি এ বিষয়টি মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি না। এজন্য একটি উদাহরণ দিই–

আগুনে উথলানো কেটলি অনেকেই দেখে থাকবে। যদি এর মুখ মজবুত করে বন্ধ করে দেয়া হয় আর নিচে জ্বাল দেয়া হয়, তাহলে এতে বিস্ফোরণ ঘটবে। আর যদি নিচে ছিদ্র করে দেয়া হয় তাহলে পানি পড়ে যাবে। কেটলি পুড়ে যাবে। পক্ষান্তরে একটু গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে যে, এই বাষ্পেরই সঠিক ব্যবহার করে করে কল-কারখানা চলে, ট্রেন চলে, আরও অনেক বিস্ময়কর কাজ হয়।

প্রথম প্রকারের উপমা হলো, যে কামনাকে জোরপূর্বক দমিয়ে রাখে আবার কামনা নিয়ে ভাবনায় বিভোর থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকারের উপমা হলো, যে কামনা পূরণে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে চাহিদা পূরণের জন্য নিষিদ্ধ জায়গায় গমন করে। তৃতীয় প্রকারের উপমা হলো, আত্মউন্নয়নকারী।

আত্মউন্নয়ন হলো নিজেকে আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রফুল্ল রাখা। যার মাধ্যমে পুঞ্জীভূত এ শক্তি নিঃশেষ হবে। খোদামুখিতা, ইবাদত-বন্দেগী ও কর্মব্যস্ততা এ আবদ্ধ শক্তিকে কাজে লাগাবে। মনে যা কল্পনা আসে তা গজল, গল্প ও কবিতায় তুলে ধরলে অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হবে। দৈহিক পরিশ্রম খেলাধুলাও এক্ষেত্রে অনেক কার্যকর।

মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। নিজের ওপর কাউকে বেশি প্রাধান্য দেয় না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশস্ত কাঁধ, সুদৃঢ় বুক আর পেশীবহুল হাত দেখলে যে কোনো নারীদেহের চোখে তা ভালো লাগবে। এর জন্য এত সুন্দর দেহ, পেশী ও শক্তি বলি দেবে না। কালো কিংবা নীল চোখের জন্য হাড্ডিসার কঙ্কালে পরিণত হতে চাইবে না। তাই বিবাহই এ রোগের একমাত্র ওষুধ। এটাই পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা। বিয়ে সম্ভব না হলে আত্মউন্নয়ন। এটা সাময়িক সমাধান। কিন্তু বেশ শক্তিশালী ও উপকারী। এতে ক্ষতির লেশমাত্রও নেই। নেই কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

রাজকন্যা হলো চোরের বউ

হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী রহ. লিখেছেন–

এক খোদাভক্ত বাদশাহ ছিলেন। তার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। কন্যার বয়স হয়েছে। বিয়ে দেবেন। কিন্তু একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান পাত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

এক রাতে বাদশাহ ও তার স্ত্রী মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করছিলেন যে, যদি কোনো অবিবাহিত যুবক একাধারে চল্লিশ শুক্রবার জুমার নামাজে মসজিদের প্রথম সারিতে একেবারে ডানের কোণে সকলের আগে নামাজ পড়ার জন্য যায় এবং যদি তাকে সহীহ-শুদ্ধভাবে নামাজ আদায় করতে দেখা যায়, তাহলে তার কাছেই মেয়েকে বিয়ে দিবেন।

ঘটনাক্রমে ঐ রাতে এক যুবক চোর বাদশাহর ঘরে সিঁদ কাটার জন্য ওৎ পেতে থাকে। সে বাদশাহ ও তার স্ত্রীর কথাগুলো শুনতে পায়। কথাগুলো শুনতেই তার চোখের তারাগুলো আনন্দে নাচতে থাকে। তখনই তার মাথায় বুদ্ধি আসে যে, চুরি করে আর কতটুকু লাভবান হওয়া যাবে; তার চেয়ে প্রথম সারিতে সর্বডানে চল্লিশ জুমার নামাজ আদায় করে বাদশাহর মেয়েকে বিয়ে করতে পারলেই সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও অনাবিল আনন্দের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা যাবে। অতঃপর স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে যুবক চল্লিশ জুমা অনুরূপভাবে নামাজ আদায় করতে থাকে।

দিন যত গড়াতে থাকে যুবকের মনেও আল্লাহ তায়ালার মহব্বত তত প্রগাঢ় হতে থাকে। সে ইবাদতের এতই মজা পেয়ে যায় যে, এখন আর তার মাথায় রাজার মেয়ে বিয়ে করার বিষয় মোটেই উঁকি দেয় না। এভাবেই চলতে থাকে তার চল্লিশ জুমার নামাজ।

ব্যাপারটি বাদশাহর নজরে আসে।

এক পর্যায়ে বাদশাহ মুসল্লি যুবককে ডেকে পাঠান। যথারীতি ছেলেটি বাদশাহর দরবারে আগমন করে।

এবার বাদশাহ বলেন, বাবা! আমার একটি মেয়ে সাবালিকা হয়েছে। তার বিয়ের জন্য আমরা তোমাকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছি। এখন তোমার মতামত বল।

জবাবে ছেলেটি বলে, বাদশাহ নামদার! আমি এ কয়দিনে যার ইবাদত করেছি, তা বাদশাহর মেয়েকে বিয়ে করার চেয়ে অনেক বড় রকমের

পাওয়া। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করে, এ নেয়ামতের অবমাননা করতে রাজি নই। আমাকে মাফ করবেন।

যুবকের এই আল্লাহপ্রেম দেখে তো রাজার চোখ আরো ছানাবড়া। যে করেই হোক মেয়েকে যে এই পাত্রের কাছে বিয়ে দিতেই হবে! কিন্তু শত চেষ্টা করেও যুবককে যে এ বিয়েতে রাজি করানো যাচ্ছে না। ফলে বাদশাহ ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমকে খোঁজ দিলেন। তিনি এলে তাকে দিয়ে যুবকের কানে বিয়ের শরয়ি ফজিলতের কথা শোনাতে থাকেন। এমনকি বিয়ে যে নবীজীর সুন্নাত এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত– এ বিষয়টি তার মাথায় পৌছানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকেন।

তিনি কুরআন মাজিদের এই ঘোষণা ব্যাখ্যা করে শোনাতে থাকেন যে–

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। *[সূরা নূর : ৩২]*

অবশেষে ইবাদতের অংশ মনে করে ঐ যুবক বাদশাহর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়।

পরকীয়া নরকীয়া

এক ভদ্র বিবাহিত যুবক ঘটনাক্রমে এক সুন্দরী যুবতির প্রেমের ফাঁদে পড়ে। বেচারির স্বামী প্রবাসী। একমাত্র সন্তানের বয়স চার বছর। টগবগে যৌবন তার উছল উছল করে। কিন্তু স্বামীবিহীন কামনার ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে বালির সাথে মিলিয়ে যায়। স্কুলের শিক্ষক যুবকের দেহ জুড়ে তারুণ্য ঠিক পড়ছে। সে বিবাহ করেছে বছর দুয়েক আগে। এই বিবাহিত যুবক-যুবতির মাঝে গড়ে ওঠে মন দেয়া-নেয়া। তাদের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, একে অন্যকে ছাড়া চলে না। মেয়েটি বিবাহিত যুবকটিকে বলে, আচ্ছা! এভাবে লুকোচুরি করে আর কতদিন চলবে? আমি যে তোমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারি না। আমি তোমার সাথে সুখের ঘর বাঁধতে চাই।

জবাবে যুবক বলল, তাহলে দিন-তারিখ ঠিক করে বিয়ে সম্পন্ন করে ফেললেই তো হয়।

যুবকের আগ্রহ দেখে যুবতি তার পূর্বেকার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার প্রস্তাব দেয়।

যুবকও তার কথায় সায় দেয়। কিন্তু সে পড়ে এক অন্যরকম বিপাকে। কারণ স্ত্রীকে তো আর এমনিতেই তালাক দেয়া যায় না। তার কোনো না কোনো দোষের অজুহাতেই তো তাকে তালাক দিতে হবে। কিন্তু সে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার মতো কোনো দোষ খুঁজে পায় না। একজন সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে তালাক দিতে তার বিবেকে চরমভাবে বাঁধে।

এবার মহিলা বলে, যদি তুমি নিজে তালাক দিতে না চাও; তাহলে মেয়েটির প্রতি নানা ধরনের দোষ চাপাতে থাক। মেজাজ খারাপ করাসহ তাকে গালিগালাজ করতে থাক। তাহলে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে নিজে নিজেই চলে যাবে।

যুবতির এই ফন্দি যুবকের মনে ধরে। সে প্রেমিকার কথা আমলে নেয়।

প্রতিদিনের মতো আজো বাড়ি এসে ভাত খেতে বসে। কিন্তু তার মাথায় যে শয়তানি ভর করেছে! তার কাঁধে যে সওয়ার হয়েছে পরকীয়ার ভূত! সে খেতে বসেই বলতে থাকে, কী রেঁধেছ? ভাত ফুটেনি। তরকারি সিদ্ধ হয়নি। লবণ বেশি হয়েছে। ঝাল হয়নি। তরকারির রং না হলে খাওয়া যায়? আজকের ভাতে পোড়া গন্ধ লাগছে। ডালটা টক কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাড়িতে এলে বিছানাপত্র অগোছালো দেখি কেন? আঙিনাটা পরিষ্কার দেখতে পাই না কেন। প্যান্ট কিভাবে পরিষ্কার করেছ? দাগটা ওঠেনি কেন?

যুবক যত ত্রুটির কথাই বলে, স্ত্রী সমস্ত কথায় ডান কান দিয়ে শুনে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়।

একদিনের ঘটনা। যুবক বাহির থেকে এসে কোনো দোষই খুঁজে পাচ্ছে না। দেখে আঙিনায় একটা কুকুর শুয়ে আছে।

স্ত্রীকে বলে, তোমাকে নিয়ে সংসার করা বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে। কুকুরটা আঙিনায় শুয়ে আছে। তাকে একটা বালিশ পর্যন্ত দাওনি। আমার বাড়িতে কি বালিশের অভাব?

জবাবে আল্লাহভীরু স্ত্রী তার স্বামীকে বলে যে, হে আমার স্বামী! আপনার কী হয়েছে? আপনার মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন এলো কিভাবে? আপনি

আল্লাহকে ভয় করুন। কারণ আল্লাহকে ভয়কারীর সঙ্গে তিনি থাকেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

> হে মুমিনগণ! তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তারা আল্লাহকে ভয় কর, ঠিক যতটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত ততটুকু। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। *[আল ইমরান : ১০২]*

কিন্তু চোর শোনে কি আর ধর্মের কথা? যুবকের মাথায় যে পরকীয়ার নরকীয়া পুরোদস্তুর আছর করে আছে। তাই এখন তার কাছে কোনো সত্যই সত্য মনে হয় না। অবশেষে সে ধর্মপ্রাণ মহিলাটিকে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

দু' প্রমিলার করুণ গল্প

আজ প্রেম খেলায় মত্ত দু'প্রমিলার করুণ গল্প শোনাব।

প্রথম গল্পটি এমন–

ভার্সিটিতে পড়ুয়া এক ছাত্র ও ছাত্রীর মাঝে পড়াশোনার ফাঁকে পরিচয় ঘটে। নানা কথাবার্তা ও খবরাখবর আদান প্রদানের মাধ্যমে একে অপরকে ভালো লাগতে শুরু হয়। তারপর মন নেয়া-দেয়াসহ দৈহিক সম্পর্ক ঘটে। শুরু হয় একে অন্যের বাসায় অবাধে যাতায়াত। এভাবে চূড়ান্ত ভালোবাসার পর্যায়ে পড়ে। একে অপরের প্রতি গড়ে তোলে অগাধ আস্থার প্রাচীর। তারা মনে মনে ভাবতে থাকে যে, তারা ঘর বাঁধবে, সংসার করবে।

ঠিক এই সময়। ঐ ছাত্রীটির রূপের আগুনে পুড়তে শুরু করে এক প্রভাষক। শুরু হয় ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ক। পরে সখা-সখী। তারপর বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়। কিন্তু আগের প্রেমিক ছাত্র! তাকে তো কিছু বলা দরকার। এই ভেবে ছাত্রীটি প্রেমিক ছাত্রকে 'মানবিক কারণেই প্রভাষকের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে' জানাতে তার রুমে যায়।

বেশ কয়েকদিন পর প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা! তাই শুরু হয় এই সেই আলাপ। এক ফাঁকে ছাত্রীটি বলে ফেলে যে, আমি খুবই দুঃখিত যে, অমুক স্যারের সাথে আমার বিয়ের তারিখ নির্ধারণ হয়েছে। বিষয়টি তোমাকে

জানার জন্য না এসে পারলাম না। সেই বিয়েতে তোমার উপস্থিতি কামনা করছি।

ছেলেটির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তার মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। ছেলেটি কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে তাকে জানায় যে, আরে! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি! তুমি আমাকে বিয়ের দাওয়াত দিতে এসেছ! অথচ এদিকে আমি তোমাকে বিয়ের জন্য প্রায় সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি।

জবাবে ছাত্রীটি বলে, দেখ! তুমি আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। আর উনি হলেন সরকারি কলেজের প্রভাষক। এটি আমার জন্য একটা বড় পাওয়া।

ছাত্রটি বলে, তাহলে কি আমাদের এতদিনের প্রেম-ভালেবাসার কোনোই মূল্য নেই?

প্রত্যুত্তরে ছাত্রীটি বলে, এরকম প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ছেলে মেয়েদের মধ্যে হয়েই থাকে।

ছাত্রটির মাথায় রক্ত ওঠে যায়। সে বলে, তাই বলে কি আমার সুখের ঘর তছনছ করে তুই অন্যের ঘর বাঁধতে বাধতে চাস? এই বলেই সে তার উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে।

পরক্ষণেই খুনের দায়ে ভীত হয়ে পড়ে ছেলেটি। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। অবশেষে মেঝের প্লাস্টার তুলে গর্ত খনন করে গর্তে ছাত্রীটির লাশ রেখে দেয়। ব্যাপারটি একদম গোপন হয়ে যায়।

এদিকে মেয়েটির খোঁজ না পেয়ে তার অভিভাবকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজ করেও সন্ধান না পেয়ে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

এদিকে ছেলেটির হাতে একটা ঘা হয়। চিকিৎসার জন্য সে একজন খ্যাতিমান মহিলা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, আঘাতটি কোনো মহিলার দাঁতের কামড়। ডাক্তার ছিলেন ঐ ছাত্রীরই বোন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে জেরা শুরু করেন।

এক পর্যায়ে ছাত্রটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় প্রমিলার গল্পটি শুনুন এবার–

এক প্রগতিশীল যুবতি বেশ কয়েকজন যুবকের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। তাদের সাথে চলে তার দৈহিক সম্পর্ক। যুবতি যুবকদের বলে যে, এভাবে

মধুর ভালেবাসা করে আর কতদিন চালানো যাবে? তার পরিবর্তে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেই ভালো হয় না?

যুবতির এই প্রস্তাবে কেউই রাজি হলো না। পরিশেষে যুবতি এক যুবককে বিয়ের জন্য টার্গেট করে। কিন্তু সেও তাকে বিয়ে করতে অনীহা প্রকাশ করে। অগত্যা যুবতি কোর্টের আশ্রয় নেয়। গভর্নমেন্ট উকিল যথারীতি জেরার মাধ্যমে যুবককে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেন।

এ সময় যুবতিটি বলে, মহামান্য আদালত! একজন নারীর মান-সম্মান আছে। অহেতুক একজন ছেলের সাথে নিজ দৈহিক সম্পর্কের কথা কোনোক্রমেই বলতে পারে না। নিজেকে কলঙ্কিত করতে পারে না। এদিক থেকে বিবেচনা করে যুবককে দোষী সাব্যস্ত পূর্বক রায় প্রদানের জন্য বিজ্ঞ বিচারকের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এবার যুবক মাননীয় বিচারকের কাছে কিছু বলার আবেদন করায় বিচারক তাকে বলার অনুমতি দান করেন।

যুবকটি বলে, স্যার! ঐ মেয়েটি বেশ কয়েকজন ছেলের সাথে প্রেমে জড়িত। তাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি নয়। সে আমাকে জোরপূর্বক ধর্ষণের মামলা দিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে বসার চক্রান্ত করেছে। আমার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন কেউ এ বিয়েতে রাজি নয়। আমি কিভাবে এ বিয়ে করতে পারি?

এবারে ছেলের পক্ষের উকিল বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন যে, মাননীয় বিজ্ঞ বিচারক! আমি যুবতিটিকে দু'-একটি প্রশ্ন করার জন্য আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থনা করছি।

জবাবে আদালত উকিলকে যুবতিটিকে জেরা করার অনুমতি প্রদান করেন।

যুবকের উকিল বিচারকের অনুমতি পেয়ে যুবতিকে বলেন–

: আচ্ছা মা, লেখাপড়ার ফাঁকে অবসর সময়ে কিছু কর?

: হ্যাঁ করি।

: কী কর?

: সেলাইয়ের কাজ করি।

: তাহলে আমার কাছে একটু আস তো।

যুবতি এগিয়ে এলে উকিল সাহেব তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, দেখ, এই আমার হাতে সুচটা আছে। এই সুতোটি সুচের মধ্যে একটু ঢুকিয়ে দাও তো দেখি।

যুবতি সুঁইয়ের ছিদ্রে সুতো দিবে– এমন সময়ে উকিল সামান্য একটু সুচটি নড়ান। এ রকম কয়েকবার করার পর যুবতি সুতোটিকে মুখের লালা নিয়ে একটু পাকিয়ে সুচটিতে ঢুকানোর চেষ্টা করল। যেই মাত্র সুতার মাথাটি সুঁইয়ের ছিদ্রের কাছে আনল অমনি উকিল সাহেব সুচটি সামান্য একটু নড়ান শুরু করেন। এভাবে যুবতি কয়েকবার এ রকম করার পরও ব্যর্থ হয়ে উকিল সাহেবকে বলে ওঠে, 'আপনি এটি নাড়ালে কি সুচটা দেয়া সম্ভব!'

তৎক্ষণাৎ উকিল সাহেব গলা ঝেড়ে বলে ওঠেন, মহামান্য আদালত! সামান্য নাড়ানাড়ির কারণে যদি সুচটিতে সুতো দেয়া না যায়, তাহলে যুবতি যদি নড়াচড়া বা চিৎকার করত তাহলে কি এ যুবক তাকে ধর্ষণ করেত পারত?

যৌনচুল্লি আর বিদ্যুৎ

যৌন বিজ্ঞানীগণের চিন্তাধারার মাধ্যমে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। চুম্বকের আকর্ষণে বিদ্যুতের সংযোগ সাধন হয়। এ বিদ্যুতের তারে মানুষ সংস্পর্ষিক হয়ে যেন মৃত্যুবরণ না করে এজন্য তারগুলোকে বিদ্যুৎ অপরিবাহী রাবার দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। তাছাড়া তারগুলোকে নাগালের বাইরে রাখা হয়। বিদ্যুতের তার স্পর্শ করা ছাড়া কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীকে আকর্ষিত হতে দেখা যায় না। অথচ নারী-পুরুষের আকর্ষণ দূর থেকে হতে দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে যেনা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীকে বেশি উৎসাহী বলা হয়েছে। অর্থাৎ, নারীরা যদি যেনায় আগ্রহী না হয়, তাহলে পুরুষের পক্ষে তাকে ভোগ করাটা সহজসাধ্য হয় না। কুরআন মাজিদে এ কারণে যেনার শাস্তি আলোচনা করতে গিয়ে পুরুষের তুলনায় নারীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ۔

> ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কে একশত বেত্রাঘাতে দণ্ডিত কর।

এ কারণেই যেনা ব্যভিচার হতে বেঁচে থাকতে কুরআন মাজিদে বারবার তাগিদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

> তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। *[বনি ইসরাইল : ৩২]*

যৌন বিজ্ঞানীগণ নারীর সমস্ত অঙ্গকেই যৌন চুল্লি হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তারা বলেছেন যে, নারী হলো চুম্বকধর্মী আর পুরুষ হলো বিদ্যুৎধর্মী। এদিক থেকে চুম্বকধর্মী নারী কর্তৃক পুরুষ হয় দারুণ আকর্ষিত। এ আকর্ষণজনিত কারণেই ইভটিজিং, অবাধ যৌন মিলন ও ধর্ষণ নামক অপরাধটি অহরহ ঘটছে।

যৌন আকর্ষণের জেনারেটর হলো চোখ। এজন্য মহান আল্লাহ চোখকে সংরক্ষণের জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। বাস্তবতার আলোকে সর্বজন স্বীকৃত যে, অন্ধ পুরুষ অথবা মহিলা ব্যভিচার নামক অপরাধটির ধারে কাছেও যেতে পারে না। এমনকি ইভটিজিং সম্বন্ধেও ওদের কোনো ধারণা নেই।

তোমায় খুঁজছে রাজপথ

হে যুবক! জেগে ওঠ! আর ঘুমিয়ে থেক না! তুমি চোখ মেলে কি কিছু দেখছ না? আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশে প্রতিনিয়ত আগুন জ্বলছে।

হে যুবক! সময় এসেছে তোমার জেগে ওঠার।

তুমি সময় নষ্ট কর না। দিন শেষ অপেক্ষার।

তুমি জেগে ওঠবে এটাই আজ মুসলমানের কামনা। তুমি আজ না জাগলে মুসলমান দিবে তোমায় ভর্ৎসনা।

হে যুবক! তাকিয়ে দেখ দুনিয়ার দিকে। চেয়ে দেখ মুসলমান আজ ধুকে ধুকে কেঁদে মরছে। এর একটাই কারণ। তাহলো, মুসলমানের ঐক্য গেছে ভেঙ্গে।

তুমি ওঠ! ইসলামের ঐক্য আবার গড়ে দাও। হে যুবক! তুমি এসো। তোমায় খুঁজছে রাজপথ। তুমি ভুলে যাও ইসলাম ছাড়া ভিন্ন মত। তুমি ওমরের মতো সাহসী কণ্ঠে আওয়াজ তোল। বীর খালিদের মতো এগিয়ে যাও দীপ্ত পদক্ষেপে।

হে যুবক! তারুণ্যের উদ্যম শক্তি তোমার বাহুতে। দুরন্ত সাহসিকতায় আত্মবিশ্বাসী তুমি। তবুও তোমায় বলছি–

দুনিয়ার চাকচিক্য তোমাকে মোহগ্রস্থ করে তুলেছে!

ক্ষণিকের আলোকচ্ছটা তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে!

ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস তোমার মস্তিষ্ককে বক্র করে দিয়েছে!

সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করে তোমার সামনে প্রতিনিয়ত উপস্থাপন করা হচ্ছে!

কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ–

ভুলে গেছ কি মৃত্যু নামের এক অদৃশ্য বস্তু তোমাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরছে!

যার ধরাছোঁয়া থেকে তোমার পূর্বপুরুষদের কেউ পালাতে সক্ষম হয়নি। তুমিও পালাতে পারবে না। তাইতো বলছি, এখনো সময় আছে। "ভয় কর তাকে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতম গঠনে।" *[সূরা আততীন : ৪]*

জীবনটা অতি সামান্য। এই পার্থিব সুখের পেছনে তুমি যতই দৌড়াবে ততই তোমাকে হতাশাগ্রস্থ করে তুলবে। তার চেয়ে ফিরে এসো। হাতে তুলে নাও তোমার রবের দেয়া জীবনবিধান। আল কুরআন ও রাসূলের আদর্শে গড়ে তোল জীবনটাকে।

তুমি কি ভুলে গেছ জাহান্নামের আগুনকে? যেখানে তুমি নিক্ষিপ্ত হবে! কৃষ্ণবর্ণের অগ্নিকুণ্ড তোমার চামড়াকে দগ্ধ করে দেবে! মৃত্যুকে তুমি হাজার বার ডাকবে তবুও মৃত্যু হবে না! আবার বেঁচেও থাকবে না! খেতে দেয়া হবে পুঁজ এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য! যা তুমি গিলতেও পারবে না আবার ফেলতেও পারবে না।

তবুও কি তোমার হুঁশ ফিরবে না? তোমার ভাবনার তরি কি তীরে ভিড়বে না? তুমি বিদ্যা অর্জন কর সমস্যা নেই। তুমি সমাজ উন্নয়নে কাজ কর, সমস্যা নেই। কিন্তু এমন কোনো কাজ করা যাবে না যা তোমায় আপন সৃষ্টিকর্তাকে ভুলিয়ে দেয়!

হে বন্ধু! তোমার রব তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাইতো তুমি তোমার পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তার আজ্ঞাবহ হও। তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় ঝর্ণাধারা। এসো নবীন! এসো হে মুসলিম যুবক! এসো নওজোয়ান! দীনের পথে মোদের সাথে। বন্ধু! হও আগোয়ান।

হে যুবক! তুমি সাবধান হও!! কারণ মৃত্যুর পরই আসবে এক কঠিন সত্য। তাহলো, হাশর। সেখানে যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়াই না হতো এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম! তাহলে কতই না ভালো হতো! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। আজ আমার অর্থ-সম্পদও কোনো কাজেই আসল না। আমার সকল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বরবাদ হয়ে গেল। *[সূরা আল হাক্কাহ : ২৫-২৯]*

এবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, কী হওয়া উচিত তোমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য! আরো ভাবো যে, তোমার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাতের লক্ষ্যে কী প্রয়োজন– এই দুনিয়ার প্রতিপত্তি, নাকি আখেরাতের মুক্তি?

গুডবাই তারুণ্য! গুডবাই যৌবন!!

বয়সের ভারে আমি আজ ন্যুব্জ। আমার আগেও অনেকে এ ধাপ পেরিয়ে এসেছে। আর বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া সবাইকেই একদিন এ ধাপটি অতিক্রম করতে হবে। আমি আজ চল্লিশের কোটা পার হয়ে পঞ্চাশের পথে পা রেখেছি। যৌবনকে গুডবাই জানাতে যাচ্ছি, সে-ও আমাকে গুডবাই জানিয়ে বিদায় নিতে চায়। নতুন কোনো স্বপ্ন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নেই।

আমি অনেক দেশ ও শহর ভ্রমণ করেছি, বহু জাতির সাহচর্য লাভ করেছি এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক ধারণা অর্জন করেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতার ঝুড়ি একেবারে টইটম্বুর না হলেও একেবারে তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। তাই আজ জীবনের গোধূলি লগনে যুবতি, তরুণী, ষোড়শী কিংবা অষ্টাদশীদের কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। আমার এ কথাগুলো সঠিক ও সুস্পষ্ট। এগুলো আমার বয়স ও অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি। হয়তো অন্য কেউ এভাবে কথাগুলো বলবে না।

আমি অনেক লিখেছি, মিম্বারে, সভা-সমাবেশে ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় দাঁড়িয়ে অনেক ভাষণ দিয়েছি, অনেক নসিহত পেশ করেছি। উত্তম চরিত্র অর্জনের আহ্বান জানিয়েছি, অশ্লীলতা বর্জন ও সকল প্রকার অন্যায় কাজ বর্জনের ডাক দিয়েছি। নারীদের ঘরে ফিরতে ও কুরআনের সুপ্রসিদ্ধ বিধান পর্দার আবরণে আবৃত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি, তাদের সৌন্দর্যের

স্থানগুলো ঢেকে রাখতে বলেছি। এসব লিখতে লিখতে কলম এখন দুর্বল হতে চলেছে, কথা বলার সময় এখন মুখে তা আটকে যাচ্ছে। জীবন আমাকে গুডবাই জানাচ্ছে।

এতো কিছু করার পরও আমি মনে করি না যে, আমরা কোনো অশ্লীল কাজ সমাজ থেকে দূর করতে পেরেছি; বরং বেলেল্লাপনার লোমশ ছোবলে যেন আমরা খেই হারিয়ে ফেলেছি। বেহায়াপনা দিন দিন বেড়েই চলছে, পাপাচারিতা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং অশ্লীলতা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমার মনে হয় কোনো ইসলামি দেশই এর আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। মিসর, সিরিয়া, আরব তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সীমা পার হয়ে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশসহ সমগ্র এশিয়ায় এর আক্রমণ বেড়েই চলেছে। মহিলারা বের হচ্ছে পর্দাহীন হয়ে, সৌন্দর্যের স্থানগুলো প্রকাশ করে, মুখমণ্ডল, বক্ষদেশ এবং কেশ উন্মুক্ত করে। তাই কেন যেন আমার মনের গহীনে এই ধারণা জন্মেছে যে, নসিহত করে আমরা সফল হতে পারিনি।

কেন আমরা সফল হইনি? হ্যাঁ, আমি এ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি। একাগ্রচিত্তে ভাবনার ভেলায় চড়ে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, সম্ভবত আমরা এখনও গ্রহণযোগ্য পন্থায় নসিহত করতে পারিনি এবং সংশোধনের দরজায় করাঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমরা আল্লাহ, নবী, জান্নাত, জাহান্নামের কথা বলে বোনদেরকে আল্লাহর ভয় দেখিয়েছি; কিন্তু কাজ হয়নি। এমনকি অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছি। কিন্তু কাজের কাজ কি কিছু হলো? হয়নি।

এ বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, বহু বক্তৃতা দেয়া হয়েছে, তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। এখন আমি ক্লান্ত শরীরে পরাজিত সৈনিকের মতো ময়দান ছেড়ে বিদায় নিতে চাচ্ছি। গুডবাই জানাচ্ছি সুন্দর বসুন্ধরাকে।

তবে হ্যাঁ, অন্তিম বাক্য হিসেবেই কিছু কথা বলতে চাই। তাহলো, আমি বিদায় নিয়ে দীনি বোনদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষার দায়িত্ব সকল মুসলিম নারীর হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি। আজ হতে আমার রেখে যাওয়ার মিশনের হাল শক্ত হাতে ধরার দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করছি। বিপথগামী বোনদেরকে উদ্ধার ও সংশোধনের বিষয়টি তাদের ওপরই রেখে দিয়ে আমি তোমাদের গুডবাই জানাচ্ছি। আমি সফলতার রঙিন পতাকা পত পত করে উড়ার প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলাম।

গবেষকগণ বলেছেন– পুরুষ যখন কোনো যুবতির দিকে দৃষ্টি দেয় তখন সে তাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় কল্পনা করে। আল্লাহর শপথ! এছাড়া সে অন্য কিছু চিন্তা করে না। তোমাকে যদি কেউ বলে, সে তোমার উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ, তোমার আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট এবং সে কেবল তোমার সঙ্গে সাধারণ একজন বন্ধুর মতোই আচরণ করে এবং সে হিসেবেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়; তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করো না। তার মনভুলানো কথায় পটে যেও না।

যুবকেরা যুবতিদের আড়ালে যেসব কথা বলে তা যদি শোনা হতো তাহলে এক ভীষণ ভীতিকর বিষয় জানা যেত। কোনো যুবক যুবতিদের সঙ্গে যে কথাই বলুক, যতই হাসুক, যত নরম কণ্ঠেই কথা বলুক ও যত কোমল শব্দই ব্যবহার করুক, সেটি তার আসল চেহারা নয়; বরং সেটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ভূমিকা ও ফাঁদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুকৌশলে সে যুবতিদের সামনে তা গোপন রাখার অভিনয় করে মাত্র।

কোনো যুবক যদি যুবতিকে তার ষড়যন্ত্রের জালে আটকাতে পারে তাহলে কী হবে? কী হবে তার অবস্থা? কোনো নারী যদি এমন কোনো দুষ্ট পুরুষের কবলে পড়ে যায়, তখন সে হয়তো সেই পুরুষের সঙ্গে মিলে কয়েক মিনিট কল্পিত স্বাদ উপভোগ করবে। তারপর কী হবে? পরক্ষণেই সে তাকে ভুলে যাবে। সে তাকে দ্বিতীয়বার পাওয়ার আশা পোষণ করবে। হয়তো কয়েকবারের জন্য তাকে পেলে পেতেও পারে; তবে স্বামী হিসেবে তার সঙ্গে চিরদিন বসবাস করার জন্য এবং স্বীয় যৌবন পার করার জন্য নয়। সেই যুবক অচিরেই তাকে ভুলে যাবে। এটিই সত্য। কিন্তু সেই মেয়েটি চিরদিন সেই স্বল্প সময় উপভোগের জ্বালা ভোগ করতে থাকবে, যা কখনো শেষ হবে না।

এবার এ কথার সাথেই আরেকটি ভয়ানক কথা পৌঁছে দিতে চাই। তাহলো, এ-ও হতে পারে, সেই যুবক আহ্লাদি মেয়েটির গর্ভে এমন কলঙ্ক রেখে যাবে, যা থেকে কখনই সে পরিত্রাণ পাবে না। চিরদিন তার কপালে হতাশার ছাপ থাকবে, চেহারায় পড়বে দুশ্চিন্তার ছাপ। আর সেই যুবক! সে তাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটি শিকার খুঁজতে থাকবে এবং নতুন নতুন প্রেমিকার সতীত্ব ও সম্ভ্রম হরণের মিশনে নামবে।

একটি যুবক এভাবে অগণিত নারীকে নষ্ট করলেও আমাদের জালেম সমাজ তাকে একদিন ক্ষমা করে দিবে। সমাজ বলবে– একটি যুবক পথহারা ছিল, সে সুপথে ফিরে এসেছে। এই অজুহাতে সে হয়তো সমাজের কাছে গৃহীত হবে এবং সকলেই তাকে গ্রহণ করে নেবে। আর সেই যুবতি! সে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে চিরদিন পড়ে থাকবে। জালেম সমাজ কখনোই তাকে ক্ষমা করবে না। গুডবাই তারুণ্য! গুডবাই যৌবন!!

স মা প্ত

লেখক পরিচিতি

বিংশ শতাব্দীর এক সমাজচিন্তক দার্শনিক ড. শায়খ আলী তানতাবী। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দামেশক নগরীতে তাঁর জন্ম। পৈত্রিক আবাস মিসরের তানতা শহর হওয়ায় তানতাবী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ছাত্রজীবনেই তুখোড় মেধার কারণে তিনি গবেষক শিক্ষক-গণের দৃষ্টি কাড়েন। সেকালে গবেষণা ও জ্ঞানসাধনায় তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল ঈর্ষণীয়। সেই পরিবারেই তিনি ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বিত জ্ঞান অর্জন করে ঐতিহ্যের তিলকে সোনার প্রলেপ আঁটেন। সতেরো বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গল্প প্রকাশ হতে থাকে।

১৯৩৬ সালে সম্রাজ্যবাদীদের জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি ইরাক গমন করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর দামেশকে ফিরে এসে বিচারক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে যোগ্যতার সিঁড়ি বেয়ে তিনি প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আর লেখালেখি! সে তো তার নেশা। এ নেশা তাঁর মজ্জার সাথে মিশা। একটু সময় পেলেই এ চিন্তাবিদ কাগজ কলম হাতে লিখতে বসে যেতেন। তাঁর জ্ঞানের নিগূঢ় চশমায় ধরা পড়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে থাকা অসঙ্গতির কালো পাহাড়। সেই অমানিশা দূর করতে তিনি জ্বালান নানান রঙের জ্ঞানের মশাল। সেই আলোয় বিদূরিত হয় শত প্রকারের আঁধার-অজ্ঞানতা; সম্বিৎ ফিরে পায় হতাশাচ্ছন্ন জাতি।

গবেষণামূলক লেখালেখির খ্যাতির মধ্য দিয়ে তিনি মক্কা মোকাররমা শরিয়া কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন মিডিয়ায় যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধানমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পাশাপাশি নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় কলাম লেখা, বিষয়ভি-ত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন আর বিভিন্ন মাদরাসা-কলেজে দরসদানও চলতে থাকে সমান গতিতে।

১৯৯৯ সালে ৯০ বছর বয়সে এ শায়খ মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।